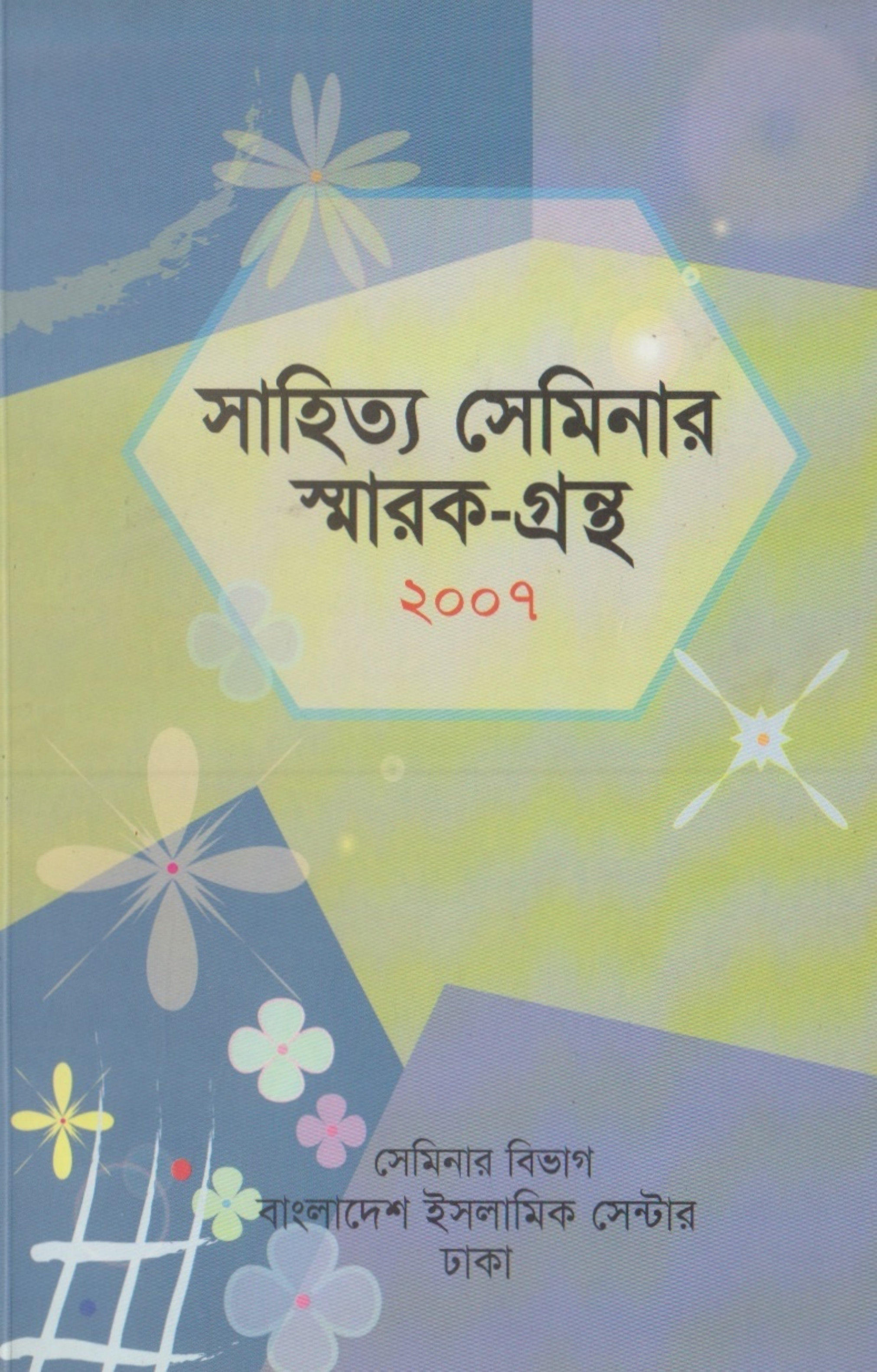

সাহিত্য সেমিনার
স্মারক-গ্রন্থ

২০০৭

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সাহিত্য সেমিনার
স্মারক-গ্রন্থ
২০০৭

সাহিত্য সেমিনার
স্মারক-গ্রন্থ
২০০৭

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সম্পাদনায়

মোশাররফ হোসেন খান

[illegible]

সৌজন্যে
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সাহিত্য সেমিনার
স্মারক-গ্রন্থ
২০০৭

সাহিত্য সেমিনার
স্মারক-গ্রন্থ
২০০৭
সম্পাদনায়
মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশনায়
সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড [৪র্থ তলা]
ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৮৬২৭০৮৬-৭
ই-মেইল : bic @ accesstel.net
প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০০৭

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

প্রচ্ছদ
গোলাম মাওলা
মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭
বিনিময়
ষাট টাকা মাত্র

সাহিত্য সেমিনার
স্মারক-গ্রন্থ

সূচীক্রম

সাহিত্য সেমিনার প্রবন্ধ

উন্নতমানের চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনার উপায়
ড. কাজী দীন মুহম্মদ ॥ ৫

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম অবদান
মোশাররফ হোসেন খান ॥ ২১

মাতৃভাষার গুরুত্ব
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ॥ ৫৯

পরিশিষ্ট

সাহিত্য সেমিনার-প্রতিবেদন
মোশাররফ হোসেন খান ॥ ৭৪

উন্নতমানের চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনার উপায়

ড. কাজী দীন মুহম্মদ

■

এক.

বিশেষ কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে বুদ্ধি এবং কল্পনার সাহায্যে লেখকগণ যে সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন তাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। সাহিত্যগত যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করে লেখক নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে বন্ধন যুক্ত করার প্রয়াস পান। প্রবন্ধ সাধারণত: নাতিদীর্ঘ হয়। গদ্য ও পদ্য উভয়ই এর বাহন হতে পারে। তবে সাধারণতঃ গদ্যই এর উপযুক্ত বাহন। পদ্যের রীতি বন্ধের মধ্যে এর স্বাভাবিক স্ফূর্তি ব্যাহত হয়। সেজন্য আধুনিককালে গদ্যরীতির মাধ্যমেই প্রবন্ধ রচিত হয়ে থাকে।

এককালে আমাদের দেশে প্রবন্ধ বলতে 'প্রস্তাব' বুঝানো হতো। রাম মোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধে 'প্রস্তাব' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রবন্ধের সমার্থসূচক অন্যান্য শব্দ 'নিবন্ধ', 'সন্দর্ভ', 'রচনা' ইত্যাদি। প্রবন্ধকারগণ বিবিধ বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করে থাকেন। ইতিহাস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় প্রবন্ধ সাহিত্যের উপজীব্য। এমনকি লেখক তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনাকেও প্রবন্ধের আঙ্গিকে রূপ দিতে পারেন। যে প্রবন্ধে ব্যক্তিগত ভাবনার অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে তা ইংরেজী Essay-এর পর্যায়ভুক্ত। এ জাতীয় সাহিত্য কর্মকেই বাংলায় রচনা বলা হয়।

কেবল বিষয়বস্তুর গৌরব বৃদ্ধিই প্রবন্ধ সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যে সাহিত্য-কর্মের মধ্যে লেখক তাঁর বিষয়নিষ্ঠতা,

রুচিশীলতা এবং সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়ে থাকেন প্রবন্ধ হিসেবে তার মূল্য অপরিসীম। প্রবন্ধ তথ্য-প্রধান হয়েও পাঠককে আনন্দ দানের ক্ষমতা রাখে। লেখক তাঁর জ্ঞানের সাহায্যে ধ্যানের সাহায্যে এবং কল্পনার সাহায্যে যে সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করে বলেই তা সাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠকের চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয়। জাগতিক বিষয় সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চারের উপায় প্রবন্ধ-সাহিত্য। সেজন্যে সাহিত্যের রস-সঞ্চার ছাড়াও জ্ঞান, ধ্যান এবং চিন্তাশক্তি জাগৃতির জন্য প্রবন্ধ-সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম।

গদ্য-সাহিত্যে প্রবন্ধের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। Saints bury প্রবন্ধকে A work of prose art বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণতঃ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে নানা গুণীর নানা মত রয়েছে। তবে সাধারণত: গদ্য এবং নাতিদীর্ঘতাই এর স্বীকৃত Form বা কাঠামো। অবশ্য কোন কোন লেখকের কিছু কিছু লেখা এমনও আছে যে, পড়লে মনে হবে দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও দৈর্ঘ্য অশোভন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে Locke-এর 'An Essay on the human understanding' এবং Mill-এর 'Library', এ শ্রেণীর রচনা। বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' বা কমলা কান্তের 'দফতর' এবং শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' এই শ্রেণীর রচনা। Pope-এর 'Essay on man' কিংবা সুরেন্দ্র নাথ মজুমদারের 'মহিলা কাব্য', কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন', সত্যেন্দ্রনাথের 'মহিলা কাব্য', কালিদাস রায়ের 'আসাম' প্রভৃতি কবিতা আকারে প্রবন্ধ বিশেষ। প্রবন্ধ পদ্যেও লেখা যেতে পারে, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সহজ এবং স্বাভাবিক বলে গদ্যে লেখার রীতিই সকলের কাছে গ্রহণীয়।

প্রাচীন সাহিত্যে Plato-এর 'Dialog,' Plily-এর 'Seneca' প্রমুখের পত্রাবলী, Plutarch-এর নৈতিক রচনাবলী, Cicero-এর 'De Senectute', 'Macus Auerelius' এবং 'Meditations' ইত্যাদিতে প্রবন্ধের এ লক্ষণই বিদ্যমান। Dryden-এর 'An Essay on Dramatic Poesy', Oscar Wilde-এর 'The critic as an Artist' এবং রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'-এর কয়েকটি রচনা কথোপকথনের আকারে পরিবেশিত হলেও সেগুলো মূলত প্রবন্ধই। Doune-এর 'Sermons', রবীন্দ্রনাথের 'শান্তি নিকেতন' গ্রন্থের ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী, এমনকি 'স্ত্রীর পত্র' নামক তাঁর ছোট গল্পটিতেও এ ধরনের প্রবন্ধের স্বরূপ বিধৃত। এতেই বোঝা যাবে যে, প্রবন্ধের আকৃতি বা রূপ-বন্ধন কত বিচিত্র হতে পারে। স্মৃতি-কথামূলক রচনা, যেমন– রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' বা ব্যঙ্গ রসাত্মক রচনা, যেমন বিদ্যাসাগরের 'ব্রজ বিলাস' ইত্যাদিও অন্যবেশে প্রবন্ধ পর্যায়ের।

প্রবন্ধ সাহিত্যের দুটি বিধা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা– (১) তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ ও (২) মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ।

১. তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ জাতীয় প্রবন্ধ তথ্য ও তত্ত্ব প্রধান। লেখকের পাণ্ডিত্য

ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় এতে সুস্পষ্ট। লেখক তাঁর মূখ্য বিষয়কে যুক্তি এবং বুদ্ধির সাহায্যে রূপদান করেন। এতে লেখকের চিন্তাশক্তি এবং মননশীলতা ও ধ্যান-ধারণার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ জাতীয় প্রবন্ধে লেখক কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করতে পারেন না। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে লেখকের তথ্য পরিবেশন, বুদ্ধি, যুক্তি এবং পাণ্ডিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য এগুলো স্বাভাবিকভাবেই গুরুগম্ভীর রূপ ধারণ করে। লেখকের অনুভূতির চেয়ে তাঁর মস্তিষ্কের পরিচয়ই এতে মুখ্য। এ শ্রেণীর লেখক লঘু কল্পনা বিলাসের দ্বারা আক্রান্ত হন না। বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের আবার কয়েকটি ভাগ আছে। যেমন,

১.১ বিবৃতি প্রধান প্রবন্ধ

ইংরেজীতে এ জাতীয় প্রবন্ধকে Narrative Essay বলা হয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা বা ব্যক্তির প্রসঙ্গে এবং বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে বিবৃতি প্রধান প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়।

১.২ বর্ণনাত্মক বা তথ্য প্রধান প্রবন্ধ

ইংরেজী Descriptive বা Informative Essay-এর প্রতিরূপ বাংলায় বর্ণনাত্মক বা তথ্য প্রধান প্রবন্ধ। সমাজ, সংস্কৃতি ও বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ববিচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ইংরেজীতে এ জাতীয় প্রবন্ধের নাম Argumentative বা Reflective Essay। ধর্মতত্ত্ব, দর্শন তত্ত্ব ইত্যাদি এ জাতীয় প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য।

১.৩ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ

শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচকদের আলোচনা ও অভিমত এ শ্রেণীর প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। এগুলোকে ইংরেজীতে Critical বা Expository Essay বলা হয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনায় যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন– রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ।

সাহিত্যের চিরন্তন উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দ দান। প্রবন্ধেরও একই উদ্দেশ্য, একথা সকলেই স্বীকার করেন। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল এবং জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে।

বিষয় মাত্রই চির পুরনো এবং সীমাবদ্ধ। ভঙ্গিই একে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে তাই বিষয়বস্তু এবং তার প্রকাশভঙ্গিই মুখ্য। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে যে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লেখা হয় তাকেই বলি তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। ইংরেজীতে বলা যায় Formal বা Informative Essay। এ শ্রেণীর প্রবন্ধ বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট সুচিন্তিত চৌহদ্দির মধ্যে আদি মধ্য ও অন্ত সমন্বিত চিন্তা প্রধান সৃষ্টি।

লেখক গরু সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে রাখাল সম্বন্ধে একটি কথাও বলবেন না। কারণ, তাতে

অতিমাত্রায় লেখকের পাণ্ডিত্য বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। এতে লেখকের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে পাঠকের বুদ্ধির যোগ হতে পারে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে পাঠক হৃদয়ের কোন সংযোগ সাধিত হয় না। লেখক অধিকাংশ সময় এমনভাবে রচনাটি সমাপ্ত করেন যে, তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই। কিংবা তার অসাধারণ চিন্তাশীলতা বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রখরতায় বিস্মিত হই। তিনি তখন পাঠকের সঙ্গে এক আসনে বসেন না। তিনি মঞ্চে আসীন গুরুর মতো পাঠককে নেহায়েত শিশু মনে করে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেন। এ প্রসঙ্গে বাংলা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন Treatise বা Monograph, জীবন চরিত, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক আলোচনামূলক রচনা বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।

২. মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ

এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যেখানে লেখকের ব্যক্তি-চিন্তা অপেক্ষা ব্যক্তি-হৃদয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। একে মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। ইংরেজীতে একে বলা হয় Familiar বা Intimate Essay। এ শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রথম লেখক Montaigne (১৫৮০)। তাঁর Essay-এর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ব্যক্তিগত হৃদয়ের স্পর্শ ও সুস্নিগ্ধ সুরভি। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ নয়, ব্যক্তিনিষ্ঠ; চিন্তা প্রধান নয়, ভাব প্রধান।

ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভূতি যখন সাহিত্যকর্মে রূপায়িত হয় তখন তাকে মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে। এ শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখকের বুদ্ধি এবং মস্তিষ্ক-বৃত্তির উপর ততখানি প্রতিষ্ঠিত নয় যতখানি তাঁর হৃদয়ানুভূতির উপর নির্ভরশীল। সেজন্য ব্যক্তি চিন্তা এখানে পরোক্ষ। ভাব এখানে যতই উচ্চস্তরের কিংবা গাম্ভীর্যপূর্ণ হোক না কেন, লেখকের ব্যক্তিহৃদয়ের স্পর্শে বিগলিত হয়ে সেই ভাব আবেগ-প্রধান সাহিত্য শিল্পে পরিণত হয়। বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের ন্যায় এ জাতীয় প্রবন্ধ তত্ত্ব এবং তথ্যের ভারে পীড়িত নয়। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকার আচার্যের ভূমিকা গ্রহণ করে পাঠককে শিক্ষা দান করে এবং তাঁর চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ পাঠকের হৃদয়ে রস সঞ্চার করে তার সুকুমার হৃদয়বৃত্তির আনন্দ বিধানের উপায় হয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধকার সীমার মাঝে অসীমের সুর সংযোজন করেন। প্রবন্ধের বিষয়কে 'আপন মনের মাধুরী'র মিশ্রণে অপরূপ শিল্পরসে সিক্ত করে অভিনব রূপ দান করেন। প্রবন্ধ শিল্পী তাঁর খেয়ালী কল্পনার সাহায্যে নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়কেও রস-মধুর করে পরিবেশন করেন। মননশীলতা ও প্রকাশভঙ্গির চাতুর্যই ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে যথার্থ রস সমৃদ্ধ শিল্পের মর্যাদা দান করে।

মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জ্ঞানের বিষয়কে হাস্যরসমণ্ডিত কুসুম পেলবতা দান করে। এর স্নিগ্ধ মধুর সুরভিত আমেজে আমরা মুগ্ধ হই। আধুনিক প্রবন্ধকারের বৈশিষ্ট্য হলো– Wisdom in a smiling mood। তাছাড়া এই শ্রেণীর প্রবন্ধ পাঠকের চারিদিকে একটি নিভৃত কুসুম পেলব বাতাবরণ সৃষ্টি করে। এতে লেখকের কম্প্র বক্ষ, নম্র নেত্র ব্যক্তি চিত্র সীমাহীন আকুতিরূপে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সার্থক স্রষ্টা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্য শিল্পীগণ। বিদ্যাসাগরের 'আত্মচরিত' রচনাটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের একটি চমৎকার নিদর্শন। ব্যক্তি হৃদয়ের কথা সহজ এবং সাবলীল ভঙ্গিতে ব্যক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বিদ্যাসাগরের রচনায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধে তাঁর কাব্যিক প্রতিভা ও হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে মিশেছে বুদ্ধির দীপ্তি ও ভাবের ঐশ্বর্য। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপই প্রধান হয়ে উঠেছে।

বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধি, চিন্তা ও জ্ঞানের পিপাসা মিটায়। আর ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জ্ঞানের বিষয়কে পর্যন্ত লঘুকল্পনা প্রদীপ্ত করে হাস্যোজ্জ্বল রূপে আমাদের মুগ্ধ করে। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে গুরুগম্ভীর প্রশ্ন বা জীবন সমস্যা অবলম্বনে সূক্ষ্ম আলোচনা করে মীমাংসার সন্ধান করা যেতে পারে। আর ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের লেখক বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য অতিক্রম করে, বরং বলতে পারি, আত্মগত ভাব-রসে স্নিগ্ধ মধুর করে পাঠকের চারপাশে একটি সুন্দর শান্ত, একটি কোমল পেলব বাতাবরণ তৈরি করে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটি নিগূঢ় নিবিড় সম্পর্কের সূক্ষ্ম সেতু নির্মাণ করেন। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখকের বিচার বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতাই মুখ্য, অথচ ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখকের অনুভূতি স্নিগ্ধ সরস-হাস্য-মধুর আত্মস্পর্শ প্রধান হয়ে ওঠে। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক নিজেকে পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে তিনি পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, অভিন্ন হয়ে, একান্ত আপনার জনের কাছে, নিজের মনের গোপন কথাটি, হৃদয়ের গোপন তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলে মনের কানে পৌছিয়ে দেন। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক আত্মপ্রচার করেন, আর ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে তিনি আত্মনিবেদন করেন। একজনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আরেকজনকে আমরা ভালোবেসে অন্তরের অন্ত:স্থলে স্থান করে দেই। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়। আর ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের মৃদু আলোর রশ্মিতে আমরা একটি বিশেষ লোককে চিনতে পারি; আবার সেই আলোকে নিজেকেও চিনে নিতে কষ্ট হয় না। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সাধারণত গুরুগম্ভীর। আর ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আকাশের নক্ষত্র থেকে মাটির প্রদীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। পরম স্রষ্টা কুলমাখলুকাতের মালিক আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার আরশে আযীম থেকে আরম্ভ করে নগণ্য পাথরের নুড়ী বা এক খণ্ড ছেঁড়া নেকড়া কিংবা একটা আলপিন পর্যন্ত এর বিষয়বস্তু হতে পারে। একথা স্মরণ করেই রবার্ট লিণ্ড বলেছেন :

Some times it is nearly a sermon, some times it is nearly a short story. It may be a fragment of autobiography or a picee of nonsense. It may be satirical or vituperative or sentimental. It may deal with any subject from the Day of judgement to a pair of scissors.

এ সম্পর্কে টি. জি. উইলিয়ামের মন্তব্যও প্রণিধানপ্রয়োগ্য। তিনি বলেন : The essay serves for exposition, for debate, for persuation, for satire, as well as for diversion and it can contrast itself to the dimensions of a news paper pargraph or enlarge itself in to a volume.

অতি পুরণে ও অতি পরিচিত আটপৌরে বিষয়কে এ শ্রেণীর প্রবন্ধকার আত্মনিষ্ঠ কল্পনার সাহায্যে আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে সাবলীলভাবে প্রকাশ করেন। তিনি জানেন যে, বলার ভঙ্গিই তার কাছে চরম। তিনি একান্তভাবে আত্মনিষ্ঠ, অকপট, খোলামেলা ও খেয়ালী। সুনির্দিষ্ট সীমার বন্ধন তাঁর পক্ষে অনেক সময় পীড়াদায়ক। তাই তিনি অবলীলায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করেন।হ্রদ সম্বন্ধে লেখতে বসে তিনি সমুদ্র দর্শন করেন। আবার সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠে তিনি বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে 'বেলা যায়' কবিতা স্মরণ করে ও তা আবৃত্তি করে মুগ্ধ হৃদয়ে তৃপ্তির নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি আগ্রার তাজমহল দর্শনের পর সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে বাগানের ধারে 'নাক্‌স্‌ভমিকা' গাছের দিকে তাকিয়ে নিজের অগ্নিমান্দ্য রোগের কথা স্মরণ করে হানিম্যানের গুণকীর্তন করেন। আবার নাক্‌স্‌ভমিকা রেখে 'চায়না'র গুণাগুণ বর্ণনান্তে হঠাৎ চীন-জাপান যুদ্ধের কথা স্মরণ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যে সরাসরি হিরোশিমার ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেন। এতসব সত্ত্বেও আমাদের এতটুকু ক্লান্তি অনুভব হয় না। শিল্পীর আপাত:অসংলগ্ন অথচ স্বত:স্ফূর্ত স্বগতোক্তিমূলক রস কল্পনায় আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ও আনন্দিত হই। এ ধরনের মুগ্ধ চিত্ততার উদ্রেকে সমর্থ রস-কল্পনাকেই ড. জনসন বলেছেন, Loose sally of the mind. এ ধরনের কল্পনা বিলাস সম্পর্কে বলা হয়েছে :

The more egotism of the author freely confessed or subtly dissembled forms the chief delight of the essay and the thoughts of the author at length become the thoughts of the reader, his passions become our passions, his humour ours, his vices follies ours.

একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে ইংরেজীতে যেমন সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সব বিষয়ে জ্ঞানের প্রবন্ধ রয়েছে, বাংলা ভাষায়ও সে ধরনের প্রবন্ধের অভাব নেই। কিন্তু আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে মন্ময় প্রবন্ধের যে ধরনের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়, বাংলা ভাষায় সে ধরনের প্রবন্ধের অভাব লক্ষণীয়। বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা সাহিত্যের 'কমলা কান্তের দপ্তরে' যে ব্যক্তিনিষ্ঠতার পরিচয় বিধৃত, যে ব্যক্তিনিষ্ঠতা ও মন্ময়তা অভিব্যক্ত হয়েছে, সেখানেও আত্মনিষ্ঠতা পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে, বলতে পারি না। আমরা যে মন্ময়তার কথা বলছি, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সুউচ্চ কবি প্রতিভা তার উপযোগী নয়। বীরবলের বুদ্ধির দীপ্তি ও বাক বৈদগ্ধ্য নিঃসন্দেহে তুলনাহীন, কিন্তু সেখানেও অন্তরের অভ্যন্তরীণ স্পর্শের অভাব সুপ্ত হয়ে আছে। আধুনিক কতিপয় সুরসিক সাহিত্যিক আত্মকথার ধরনে নিবন্ধ রচনা করে এ শ্রেণীর প্রবন্ধের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। আবুল মনসুর আহমদ, মুজতবা আলী প্রমুখের মতো লেখকের হাতে আমাদের সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ মন্ময় রচনার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের সৃষ্টি প্রাচুর্যের অভাব নগ্নভাবে প্রকট।

বাংলায় এ ধরনের প্রবন্ধের দৈন্যের কারণ রয়েছে। আমরা এ দেশের মানুষ, বাংলা ভাষাভাষী লেখকরা সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ ও অধ্যাত্মবাদী। জীবনকে সহজ সরল রসদৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে যেন আমাদের প্রাণে সায় দেয় না। জীবনকে গভীরভাবে দেখা

আমাদের জাতিগত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। জীবনের আনন্দ ও নিরানন্দ পরিবেশকে লঘুকান্তি হাস্যোজ্জ্বল করে দেখার অক্ষমতা আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই বলতে পারি আমাদের জীবনে হাস্যরসের বড় অভাব। এ কারণে আমাদের দেশে ল্যাম্ব, চেস্টার টন, ই.ডি. লুকাস, রবার্ট লিও বেলক, ও কে. জেরমীর মত প্রবন্ধ লেখকের অভাব রয়েছে। তাছাড়া আমাদের দেশে কোন লেখক ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে রস সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্যক্তিগত দুর্বলতা প্রকাশ করলে পাঠকের কাছে হেয় বলে চিহ্নিত হন। এ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণও আমাদের ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ সৃষ্টির প্রতিবন্ধক। আমরা সাধারণত: লেখকের মধ্যে কোন না কোন আদর্শের সন্ধান করি। লেখকও যে দোষে-গুণে মানুষ এবং তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের দুর্বলতাপ্রসূত রসসৃষ্টিও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে, একথা আমরা ভেবে দেখি না।

ব্যক্তিনিষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পের আরো একটি সূক্ষ্ম বিভাগ রয়েছে। তাকে সমালোচকরা বলেছেন : 'বেলে লেত্‌রস্‌' (Belles Lettres) রম্যরচনা বা রমন্যাস। প্রাচীনকালে কাব্য, কলা, কবিতা, নাটক, ব্যাকরণ শাস্ত্র– এসবকেই রম্য সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করা হতো। প্রসিদ্ধ বাক্য– 'কাব্যেষু নাটকম রম্যম' সবার মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে রম্যরচনা বা রমন্যাস বলতে কল্পনা সমৃদ্ধ শিল্প সঙ্গত যে কোন সাহিত্যকর্মকেই বোঝাতো। বর্তমানে রম্যরচনা বলতে এক শ্রেণীর লঘু কল্পনাজাত হাস্য রসাত্মক প্রবন্ধকে বুঝায়। তবে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রম্যরচনার পার্থক্য সুস্পষ্ট। ব্যক্তিগত প্রবন্ধও অবশ্য মননশীল রচনা বলে রম্যরচনা রূপে পরিগণিত হতে পারে। রম্যরচনা ব্যক্তিনিষ্ঠ বা ব্যক্তিগত নাও হতে পারে। রম্যরচনা সম্বন্ধে একালের একজন বিখ্যাত সমালোচক বলেন :

Modern usage applies the word more often to the little hills than to the mountain of literature denotes the essay and the critical study rather than the epic of the play of shakespeare.

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনাকারীদের মধ্যে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীরবল, যাযাবর, বিরূপাক্ষ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে লেখকের ব্যক্তি সৌরভ সঞ্চারিত করার ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উৎকর্ষ। লেখক নীতি-কবির মতো আত্মনিবেদিত অথচ আত্মসচেতন ও অহংঋদ্ধ কল্পনাপ্রবণ বটে, কিন্তু তাঁর অহমিকা সেখানে পাঠকের অন্তর পীড়িত করে না, বরং পাঠক তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা কল্পনা ও জীবন দর্শন এমনভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে যে, পাঠক সেটি নিজের ভাবনা-চিন্তা বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। তাঁর হাসি পাঠককে হাসায়, তাঁর দু:খ বোধ পাঠকের হৃদয়কে ব্যথিত করে, তাঁর প্রেম আর্তি পাঠকের আত্মপ্রেম ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে। এ জাতের প্রবন্ধ গভীরভাবে আত্মধ্যানমূলক বলেই অনেকে এর নাম দিয়েছে Lyric in Prose – গদ্যে গীতি কবিতা বা গীতিধর্মী গদ্য রচনা।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-শিল্পী রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেন না। কারণ রোমাঞ্চের বিষয়বস্তু কাল্পনিক। আর ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জীবনের বাস্তব অনুভূতি। ইতিহাস লেখক যেমন জীবনকে ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে দেখেন, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-শিল্পী তেমনটি দেখেন না। জীবনের সীমাহীন ঘটনা পুঞ্জের যে কোন খণ্ড ক্ষুদ্র চিত্রই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তিনি দার্শনিকের মতো জীবনের পরম সত্য উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করেন না। তিনি ঔপন্যাসিকের মত জীবনের বর্ণনাত্মক রূপ সৃষ্টি করার কথা ভাবেন না; কিংবা নাট্যকারের মত জীবনকে কর্মময় শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর আত্মধ্যানে এঁদের সবারই স্পর্শ থাকতে পারে। তিনি শুধু অপরূপের জীবনকে দুই চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখেন। আর অপরূপের সৌন্দর্য যেখানে যতটুকু ছড়িয়ে রয়েছে তাই গ্রহণ করেন এবং জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার বেদনামধুর বিস্ময় রহস্যকে আপনার মনের মমতা-মাধুরী মিশিয়ে মৃদু আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল করে তোলেন। জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুর-সঙ্গতির সন্ধান তাঁর কাজ নয়।

স্যার উইলসটন চার্চিল সাহিত্য-শিল্পের যে কোন আঙ্গিকের আর্টকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে নিজের সেনাবাহিনীকে সেনাপতি এমন কৌশলে সাজাবেন যাতে শত্রুপক্ষ অর্থাৎ সমালোচকের সূক্ষ্মদৃষ্টি কোন খুঁত ধরার সুযোগ না পায়। অথচ আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালনেরও সুযোগ থাকে।

এদিক থেকে মন্ময় প্রবন্ধকে চিত্রশিল্পের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। চিত্রের কোন্‌খানে গাঢ় রঙের প্রলেপ, আর কোথায় হালকা রঙের পোচ, কোথায় শেড বা ছায়ার আভাস সৃষ্টির প্রয়োজন, সে ব্যাপারে শিল্পী সচেতন দৃষ্টি রেখে তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির লক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন সার্থক করে তোলায় সচেষ্ট হন।

রচনার পদ্ধতিগত দিক থেকে সাহিত্য-শিল্প সরাসরি ফটোগ্রাফী নয়। কিন্তু এক স্তরে মন্ময় প্রবন্ধ লেখক, চিত্রশিল্পী ও ফটোগ্রাফারের অবস্থান একই সমতলে। ফটোগ্রাফার তার ক্যামেরা কোন্‌ অবস্থানে ধরে দর্শকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করবেন, তিনি তাঁর লক্ষ্যবস্তুর কোন্‌ দিকটি তুলে ধরবেন, তা তাঁকে স্থির করতে হবে। সার্থক কম্পোজিশনের উপর নির্ভর করে উদ্দীষ্ট সৃষ্টির সার্থকতা। মন্ময় প্রবন্ধকার তাঁর বিষয়বস্তুর সার্বিক অবয়বের কোন্‌ দিকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি-আর্কষণ করতে চান, তা তাঁর মনো কম্পোজিশ কল্পনায় স্থির করে নেন। তারই মাধ্যমে চিত্রশিল্পের মত নৈকট্য-দূরত্ব তাঁর শিল্পকর্মে অর্থাৎ রচনায় বিশদভাবে ফুটে উঠবে। তাঁর দৃষ্টি নৌকার আরোহীর প্রতি, না মাঝির প্রতি তা নির্ভর করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এ ক্ষেত্রে স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্রের মিল-গরমিলের কথাটিও স্মরণীয়।

দুই.

আলোচ্য বিষয় হল 'উন্নত মানের চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনার উপায়'। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, সাহিত্যের বাহ্য রূপ ও আঙ্গিকের বাইরে একটা অভ্যন্তরীণ রূপ আছে।

একটি বস্তুনিষ্ঠ বা বস্তুগত, তন্ময় এবং আরেকটি ব্যক্তিনিষ্ঠ বা ব্যক্তিগত, মন্ময়। ইংরেজীতে যাকে বলা হয়েছে যথাক্রমে Objective ও Subjective। প্রবন্ধ তন্ময়ই হোক আর মন্ময়ই হোক তার মূলে চিন্তা অবশ্যই থাকবে। আমরা প্রথমে বিচার করব প্রবন্ধ রচনার পরিসর নিয়ে। তারপর দেখা যাবে চিন্তামূলক প্রবন্ধ কী? এর পরে তার মান সম্বন্ধে কথা। উন্নত অনুন্নত বিচার করে দেখা যাবে। মন্ময় প্রবন্ধ সবটাই চিন্তামূলক। কাজেই চিন্তামূলক প্রবন্ধের প্রথম শর্তই হল লেখকের চিন্তার প্রসারতা ও গভীরতা থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যই হল পাঠকের মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা দান করা। যে প্রবন্ধের কোন বক্তব্য পাঠকের মনের চিন্তার উদ্রেক করে না, তা নিম্নমানের। বার্নাড শ' কোন এক জায়গায় বলেছেন, আমি Essay পড়ি Provocation পাওয়ার উদ্দেশ্যে। যে লেখা নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দেয় না, নিরুদ্দেশের পথে যাত্রায় উৎসাহিত করে না, সে লেখায় আমার কোন প্রয়োজন নেই।

একজন চিন্তাশীল বাঙ্গালী লেখক বলেছেন, "আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি মত যা লিখি, সব সময় টলস্টয় বা গান্ধীকে অনুসরণ করি না। আমার নিজের একটা বোধ আছে, একটা স্টাইল আছে। টলস্টয় ও গান্ধীর কাছে অনেক কিছু শিখেছি কিন্তু আমি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনচেতা। আমি মনে করি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত একাধারে সনাতন ও সদ্যতন। লেখকের রচনায় ফুটে উঠবে তার স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও দর্শন সঞ্জাত চিন্তা। মনে রাখতে হবে, যা বিশ্বজনীন ও সনাতন তাই নিয়ে ধর্ম, তাই নিয়ে নীতি, তাই নিয়ে বিজ্ঞান, আর তাই নিয়েই শিল্প। তাই বলে বিশ্বজনীনতা দেশ ও কাল বহির্ভূত নয়। অনেকের ধারণা, সনাতন আদিকাল থেকে আছে। কিন্তু এ ধারণা সর্বৈব সত্য নয়।

ইতিহাস ও ভূগোলের চক্র ঘূর্ণনে সনাতনও নবীন হয়ে ওঠে। তাই আমার দেশকে বা আমার কালকে অস্বীকার করে নয়, বরং স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করেই বিশ্বজনীনতায় পদার্পণ করতে হবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে, 'By the full exercise of intelligence, men must trimph over the adversities of nature and perversities of culture.' (Karl Mannheine : Ideology and Utopia).

লেখার ভেতর কোথাও জড়তা থাকবে না। এর গতি হবে সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন উভয়ই থাকবে সমান সজাগ। তার চোখে ও মনে যা ধরা পড়ে তাই তার ভাষাতে ধরা পড়বে। নিবেদিতপ্রাণ এই লেখকের ইচ্ছা হবে,

এ জীবন লয়ে আমি কি করিব, প্রভু?
ইচ্ছা করে দিয়ে যাই কালের ভাণ্ডারে
এর ছায়া বেঁচে থাক ইতিহাসে।

প্রবন্ধকারের আন্তর অনুভূতি হবে এরকম। তাঁর বক্তব্যে থাকবে নতুন ধারার ইঙ্গিত। আধুনিকতা কিংবা লোক সংস্কৃতি থেকে বিযুক্ত হয়ে নয়, আধুনিকতা ও লোক সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েই প্রবন্ধে নবচেতনার সুযোগ এনে দিতে হবে। এটিই একমাত্র পথ। এ পথে যারা চলবে তারা আপাততঃ একলা চলবে। যদিও এর মধ্যে জনগণের কথা আছে,

আরো আছে জনগণের মনের কথা। তবুও এ পথে জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। কারণ এর মধ্যে থাকবে যুক্তি, তর্ক, বিচার, বিবেক, তথ্যনিষ্ঠতা, অনুশীলন, শৃঙ্খলা, উচ্চতর মূল্যবোধ, রসজ্ঞান ও চিরন্তন সত্যের স্বীকৃতি।

লেখকের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যে-ই তার লেখা স্পর্শ করে অর্থাৎ পড়ে, সে-ই যেন একজন প্রাণবন্ত মানুষের স্পর্শ পেয়েছে বলে মনে করে। প্রবন্ধের একটি পাতা খুললেই তার কাছে পৃথিবীর বিচিত্র অধ্যায় খুলে যাবে। বিশ্ব ও প্রকৃতির পাঠ সংগৃহীত ও সংযোজিত থাকবে লেখার পাতায় পাতায়, পরতে পরতে, কথায় কথায়। আমার সামগ্রিক অভিজ্ঞতা সংহত করার ও অভিব্যক্তি দানের একমাত্র স্থায়ী ব্যবস্থা থাকবে আমার রচনায়। যেন বিশ্বের যে কোন দেশের, যে কোন জাতির, যে কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যায় লেখকের প্রাণের সে গোপন কথাটি।

হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি প্রবন্ধকার মানুষের হৃদয়ের শত সহস্র ভাবনার বন্যা প্রবন্ধের মধ্যে বেঁধে রেখেছে। সাহিত্যের শিল্পী হিসেবে আপন দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখেই আমাদের শিল্পী-রা উজ্জীবিত হবেন। আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানবতাবোধের এই মানবিক 'বাদ'-এর লক্ষণ হল : সমাজের চাইতে মানুষ বড়। সম্প্রদায়ের চাইতে, শ্রেণীর চাইতে, দলের চাইতে মানুষ বড়। দ্রষ্টারূপে, দিশারীরূপে, লেখকদের হতে হবে উত্তর পুরুষদের সত্তা সমুদ্ধারের পথিকৃৎ।

আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি রসিকতাপূর্ণ অথচ অত্যন্ত বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন অন্নদা শঙ্কর রায়। তাঁর উক্তি : 'ভবিষ্যতে যারা সংস্কৃতির গর্ব করবে তাদের এই চারটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বৈদিক বৌদ্ধ সংস্কৃতির ম্যাট্রিকুলেশন, মুসলিম সংস্কৃতির ইন্টারমিডিয়েট, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বি-এ আর লোক সংস্কৃতির এম-এ। ইচ্ছা করলে উল্টো দিক থেকেও পাশ করা যায়। কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যায়, যদি এর কোন একটি অঙ্গ বাদ পড়ে। চারটি অঙ্গ মিলেই আমাদের সংস্কৃতির চতুরঙ্গ।'

অমুসলিম সমাজ সংস্কৃতির ধারকরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন :

'আমরা চাঁদের এক পীঠ দেখেছি, অপর পীঠ অদৃশ্যই রয়ে গেছে। মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান সম্প্রসারণের প্রয়োজন।' একথা হিন্দু সমাজের সম্বন্ধে যতখানি সত্য, মুসলিম সমাজের সম্বন্ধে তার চাইতে অধিক সত্য।

হিন্দু প্রতিভাধর শিল্প-স্রষ্টারা আমাদের সম্বন্ধে পুরোপুরি জানেন না, সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমাদের খবর কী? আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আমরা এতদিন একত্রে বাস করেও হিন্দু সমাজকে যেভাবে এবং যতখানি জানা দরকার, সেভাবে এবং ততখানি জানতে পেরেছি কি? তা না হয় বাদই দিলাম। আমরা আমাদের নিজেদের সমাজকে কতখানি জানতে পেরেছি? আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে দার্শনিক সক্রেটিস বলে গেছেন : Know thy self – নিজেকে জান। আমাদের ঈমানের মর্মমূলে

রয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি। ইসলামী জীবন বিধানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে : 'মান আঁরাফা নাসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' – যে নিজেকে জেনেছে, সে তার প্রতিপালক রবকে জেনেছে। আমরা তো অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করি যে, মুসলিম সংস্কৃতি আল কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক। সত্যি বলতে কি, আমরা আল কুরআন ক'জনে পড়েছি? কতটুকু পড়েছি? আর কতটুকু বুঝেছি? ক'জনে বুঝেছি? আর বুঝে ক'জনে কতখানি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছি?

আমাদের কোন এক সাহিত্যিক আমাদের তরুণদের দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনটি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

১. আমরা কেবল বাংলায় জনকয়েক নই। আমরা সর্ব দেশের অসংখ্য জন পরিবৃত। আধুনিক বাংলা সাহিত্য আসলে আধুনিক বিশ্ব সাহিত্য।

২. আমরা দেখেছি অনাহার, অত্যাচার, নৃশংসতা, নির্বোধত্ব ও অধৈর্য, অসহায়ত্ব দেশব্যাপী, বিশ্বব্যাপী। আমরা দেখেছি চাঁদ, কোকিল, দক্ষিণ হাওয়া। চৌদ্দ বছর থেকে উপরে চৌষট্টি বছর পর্যন্ত কবিতা লেখা আমাদের চোখে অপরাধ। আমাদের লেখায় ফুটে উঠবে সময়ের কথা, হাটের কথা, ঘাটের কথা, মাঠের কথা, ঝড়ের কথা, বন্যার কথা, মঙ্গার কথা, উপবাসীর কথা, প্রতারকের কথা, ক্ষেত মজুরের কথা, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসীর কথা। কিন্তু ঘরের কথা ভুলে নয়। এ হতে পারে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, এককথায় সাহিত্য নীতি। পদে পদে মনে হবে এ জিনিস তো আমাদের খাঁটি স্বদেশী অথচ মোড়ক বিদেশেরও হতে পারে। চমকপ্রদ মোড়কে বিদেশে রফতানীও হতে পারে এ সম্পদ।

৩. আমরা যে আমাদের পূর্ববর্তীদের তুলনায় খুব বেহায়া, এ অভিযোগ বোধ হয় ঠিক নয়। আমাদের অপরাধ, আমাদের পূর্ববর্তীরা যে ক্ষেত্রে চোখ বুজে ছিলেন, আমরা সে ক্ষেত্রে চোখ খোলা রেখেছি।

তিন.

সাহিত্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সুইন বার্ণ বলেছেন, Probable impossibilities are to be preferred to improbable possibilities. সম্ভাব্য বাস্তব সম্মত বিবরণই গ্রহণযোগ্য সত্য।

একবার আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম। বেশ আগে। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ হাতির চীৎকার শুনে অবাক হলাম। আওয়াজ লক্ষ্য করে কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! একটি ব্যাং একটি হাতিকে গিলতে আরম্ভ করেছে। ঘটনাটি বাস্তব সত্য। ঘটনা সত্যি কিন্তু অবিশ্বাস্য। এটি possible but improbable. কিন্তু যদি আমি বলি যে, আমি দেখলাম, একটি অজগর একটি হরিণকে ধরে গিলে ফেলেছে। ঘটনা কিন্তু ঘটেওনি কিংবা আমি দেখিওনি। তা সত্ত্বেও এটি impossible but probable. এটি সাহিত্যের সত্য। এজন্যই কবি বলেছেন :

'ঘটে যা তা সব সত্য নহে,
সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান
অযোদ্ধার চেয়ে সত্য জেনো।'

প্রসঙ্গত আর একটি কথা মনে পড়ল। উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সাল। নয়া দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে এশিয়ান লেখক সম্মেলন। প্রেসিডেন্ট রাজা গোপাল আচারী সমবেত সাহিত্যিক অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি সকল কথার মধ্যে একটি মোক্ষম কথা বললেন : আপনারা সাহিত্যিক। সত্য কথা বলবেন। আমরা প্রাসাদ নির্মাণ করি। বৈঠকখানা নানাভাবে মহামূল্য সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করি। অথচ সে ঘরে আমরা খুব অল্প সময়ই কাটাই। অথচ রান্নাঘরে প্রায় সারাদিন থাকতে হয়। কিন্তু সেটি অতি সাধারণভাবে সাজাই। আরও একটি কথা। বাথরুম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেটি কি আমরা কখনও নানা সাজ সজ্জায় সজ্জিত করি?

আপনারা সাহিত্য করবেন; কথায় কথায় বাথরুমের প্রাধান্য তুলে ধরবেন না। সাহিত্য আমাদের জীবন প্রাসাদের বৈঠকখানা, তারপর শোয়ার ঘর, তারপর রান্নাঘর, তারপর স্নানাগার। যে সাহিত্যে বৈঠকখানার সৌন্দর্য দর্শকদের কাছে মনোরম করে তুলে ধরা হবে, সে সাহিত্যই মনোরম। আর সে সাহিত্যই দীর্ঘমেয়াদি, স্থায়ী। কথায় কথায় বাথরুম প্রদর্শন মানেই জীবনের অশ্লীলতার নগ্ন প্রকাশ। আর তা জীবনের চিত্তবৃত্তির স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। কাজেই তা পরিত্যাজ্য।

চিন্তামূলক প্রবন্ধের আওতায় এ প্রস্তাব অপ্রাসঙ্গিক জেনেও বলছি। আমাদের অনেকেই সুষ্ঠু সুন্দর যথাশব্দ প্রয়োগের চাইতে যথেচ্ছ সুড়সুড়িদায়ক শব্দ প্রয়োগে আগ্রহী।

আবার বলছি এরা খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, ধার করা মরীচিকা-সংস্কৃতি এদের সাহিত্যকৃতির শিকড়ে কীটদৃষ্ট বিষ সিঞ্চনে ব্যস্ত। এঁরা 'মামদো ভূত'-এর গল্প লেখক। এঁরা জানে না যে হযরত 'মুহাম্মাদকে' শ্লেষ করার উদ্দেশ্যেই ঐ নামের ভূতের আবির্ভাব।

আমি জানি, কথাগুলো আপনাদের অনেকের কাছে একঘেয়ে বোরিং মনে হচ্ছে। এর কারণ, আগ্রহের অভাব। আসলে ঐকান্তিক আগ্রহ থাকতে হবে। সত্যিকার অর্থে ঝুনা নারকেলের উপরের খোলস বা ছোবরা ভেদ করে ভেতরকার 'শাঁস'-এর স্বাদ গ্রহণ করতে চাইলে প্রচুর 'অধ্যবসায় বিমিশ্র শ্রদ্ধাশ্চ', শ্রম দিতে হবে।

সূর্য আদিকাল থেকে আছে। সমানে তাপ দিয়ে যাচ্ছে বিধির বিধান মুতাবিক। কিন্তু সারারাত সংগ্রামের পর প্রতিদিন যখন রাতের আঁধার ঠেলে ফেলে নবীন উদ্যমে উদিত হয়, তখন তার রূপ সৌন্দর্য তারুণ্য আলাদা স্বরূপে আলাদা শৌর্যে 'লয়-প্রলয়' সাথে নিয়ে, বিরাট-বিশাল অগ্নিকুণ্ডের প্রতাপ নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করে প্রলয়ঙ্করী দ্বিপ্রহরের ইঙ্গিত বহন করে। এরূপ বিশাল সম্ভাবনাময় মানুষকে আত্মবিশ্বাসের মহাবলে

বলীয়ান হয়ে অভীষ্ট কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বস্তুত আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই বলেই হীনমন্যতায় ভুগি; সত্যিকার পৌরুষদীপ্ত কর্মোদ্যম প্রকাশে পশ্চাৎপদ হই।

নিচে উদ্ধৃত উপনিষদীয় বাণীটি সর্বদা স্মরণ রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি :

শ্রদ্ধা দদাতি বিদ্যাং,
বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।
বিনয় দদাতি জ্ঞানম্,
জ্ঞান দদাতি প্রজ্ঞাং ॥

শ্রদ্ধা দান করে বিদ্যা। বিদ্যা দান করে বিনয়। বিনয় দান করে জ্ঞান। জ্ঞান দান করে প্রজ্ঞা।

সেকালের মুনী ঋষিরা 'শ্রদ্ধা'র সংগে যোগ করেছেন 'অধ্যবসায়'ও। তাঁদের ভাষায় 'অধ্যবসায় বিমিশ্র শ্রদ্ধাশ্চ দদাতি বিদ্যাং ... ...প্রজ্ঞাং'॥

চার.

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা

বিবৃতিমূলক ও ঘটনা বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া আর সকল প্রবন্ধই চিন্তামূলক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে কোন প্রবন্ধ লেখার সময় নিচে উল্লেখিত নির্দেশনার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাষা প্রয়োগ ও রচনা কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।

১. স্মরণীয় যে, অধ্যয়নই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। নির্ধারিত বিষয়ে সকর্ততার সঙ্গে গ্রন্থ নির্বাচন করে অধ্যয়নে নিবিষ্ট হতে হবে। সুনির্বাচিত বই মনোযোগ সহকারে পাঠের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে পূর্বসূরী পণ্ডিত ব্যক্তির সুনির্বাচিত নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে। আবার বলছি, উদ্দীষ্ট বিষয়ে সুনির্বাচিত বই মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে।

এ সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের একটি নির্দেশিকা প্রণিধানযোগ্য। তিনি একদা তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্-এর ব্যবস্থাপক (স্যার পি. সি. রায়ের ছাত্র) প্রফুল্ল চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'প্রফুল্ল, তুমি কি শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পড়েছ?' প্রফুল্ল বাবু উত্তরে বললেন, 'আজ্ঞে, পড়েছি।' আচার্য প্রশ্ন করলেন, 'কত সময় লেগেছে?' উত্তরে ম্যানেজার বললেন, 'ছয় ঘন্টায় পড়ে শেষ করেছি।' তখন গুরু পি. সি. রায় বললেন, 'দেখ, আমিও পড়েছি। বইখানি পড়তে আমার ছয় মাস লেগেছে। তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পার। আমি গ্রন্থখানির প্রতিটি লাইন এবং প্রতিটি-শব্দ তোমাকে বলে দিতে পারব।' এরপর তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, বলতো, নবম পরিচ্ছেদে নায়িকা যখন পাশ ফিরে বসল, তখন নায়ক কী বলে তাকে সম্ভাষণ করেছেন? এবং এ পরিচ্ছেদের শেষের অংশে কী বিবৃত হয়েছে?' প্রফুল্ল বাবু জবাবে বললেন, 'স্যার, ভুলে গেছি। বলতে পারব না।' তখন আচার্য পি. সি. রায় বললেন, 'পরীক্ষার প্রস্তুতির

জন্য যেভাবে পড়েছ, সেভাবে পড়তে হবে। জীবনে যে কোন বই পড়বে, সবই এ ধারায় পড়বে। ভাল লেখকের ভাল বই একবার নয়, দু'বার নয়, প্রয়োজনে সাতবার পড়বে।'

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মহামূল্য উপদেশ সকল পাঠকেরই অনুসরণীয়। মনে রাখতে হবে, বই পড়ে মানুষ শিক্ষিত হয়। বই পড়েও যে শিক্ষিত হয় না তার পড়া বৃথা। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, সুশিক্ষিত মানেই স্বশিক্ষিত। স্বশিক্ষায়ই সত্যিকার সুশিক্ষা হয়। সে শিক্ষায়ই শিক্ষিত ব্যক্তি আলোকিত হয় এবং তার আলো থেকে অন্যে আলো পায়। যে শিক্ষায় নিজেকে ও অপরকে আলোকিত করতে না পারে, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়।

২. ভাষাকে মনে করা হয় প্রবন্ধের দেহ। ভাষা প্রবন্ধের রস-সমৃদ্ধ সুরভিত কুসুমের পাপড়িগুচ্ছ। সুস্থ দেহের সুঠাম গঠন ও সৌন্দর্য যেমন দেহকে সুদর্শন ও আকর্ষণীয় করে তোলে, তেমনি ভাষাও আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে প্রকৃত সুষ্ঠু সুন্দর যথাযোগ্য শব্দ সংযোজনে। দেহের যেমন কতকগুলো স্বাস্থ্য বিধান রয়েছে, তেমনি ভাষা প্রয়োগেও কতকগুলো বিধিবিধান মেনে চলতে হয়। ভাষার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সম্বন্ধে যেমন সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি ভাষার বিভিন্ন উপাদানের যথাস্থানে যথাযোগ্য ব্যবহারেও অভ্যস্ত হতে হবে। একথা ঠিক যে, ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে। বিদ্যমান ভাষা নিয়েই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের বিধিবিধান পূর্ব নির্ধারিত (Pre determind) নয়। ভাষায় যা আছে, সেসব উপাদানই বৈয়াকরণ শৃঙ্খলার সঙ্গে বিবৃত করেন। 'ব্যাকরণ কঠিন ও দুষ্পাঠ্য'– একথা বলে একে দূরে রাখা নির্বোধের কাজ। ভাষায় যে সকল উপাদান প্রযুক্ত হয়, তার Prescription নয়, Description-এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিবরণ দেয়াই বৈয়াকরণের কাজ।

ভাষার বিভিন্ন উপাদান-ধ্বনি, রূপতত্ত্ব, কার, ফলা, বানান, বর্ণ, যুক্তবর্ণ, শব্দ, শব্দ গঠন প্রণালী, শব্দমূল, ধাতু, বিভক্তি, প্রত্যয়, শব্দের প্রকারভেদ, বিভিন্ন ভাষাসূত্র, শব্দ সম্ভার, সন্ধি, সমাস, কারক, বিভিন্ন পদ, বাক্য, বাক্যাংশ, পদক্রম, শব্দযোগ্যতা, পদযোগ্যতা, অর্থতত্ত্ব, উপভাষা, কথ্যভাষা, লেখ্যভাষা, চলিতরীতি, সাধুরীতি, মানচলিত লেখ্যরীতি ইত্যাদি সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করা হয় ব্যাকরণ শাস্ত্রে। ভাষার এসব উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ যোগ্যতার অভাবে রসালো বাক্য ও সমৃদ্ধ রচনার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষ করে ভাবের অনুগ ভাষার প্রয়োগ কৌশল আয়ত্তে না থাকলে, প্রবন্ধের দেহ ও দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু সুঠাম ভাষাশৈলী প্রযুক্ত না হলে বক্তব্য পাঠকের হৃদয়বেদ্য হয় না। ভাষার সরলতা, মাধুর্য, সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতার প্রতি দৃষ্টি রাখা পাঠক সাধারণকে ধরে রাখার প্রকৃষ্ট উপায়।

৩. অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি এ দুয়ের গভীরতা ও প্রসারতার মাধ্যমে সত্য দর্শনে উদ্যোগী হতে হবে। আত্মার সমৃদ্ধি সাধন এবং বোধ ও বোধীর উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে নিজস্ব ও পরস্ব

সংস্কৃতি ও ধর্ম দর্শন সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা ভাষায় রস সিঞ্চনে সহায়ক হয়। ভাবের গাম্ভীর্য ও চটুলতা যথাযথ বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে উপলব্ধি যোগ্যতা অর্জন করে এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির সহায়ক হয়।

বর্তমান বাংলা ভাষায়, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় অঞ্চলেই, সাধুরীতির ব্যবহার নেই বললেই চলে। লেখ্য মানচলিত (কৃত্রিম) রীতি প্রয়োগেই আধুনিক লেখকের প্রতিভার স্ফূর্তি লক্ষ্য করা যায়। মান চলিত লেখ্য রীতিতে সাধারণত তৎসম শব্দের আধিক্য অশোভনীয়। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি অপরিহার্য।

৪. ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, প্রকৃতি-পরিবেশ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকতে হবে।

৫. কর্ম বিদ্যা ও ধর্ম চিন্তার সমন্বয় সাধন বিশেষভাবে প্রয়োজন। ধর্ম উপদ্রব নয়, কর্ম-নিয়ামক ও পথ নির্দেশক। সহায়ক বিষয়ে জীবন ভাবনা ও আধুনিকতার পরিশীলন। একান্ত দরকার।

৬. ধর্ম, জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সত্য সূত্র সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন।

৭. আধুনিক বিশ্ব দেশ-জাতি-ধর্মনীতি-রাজনীতি-অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, আবিষ্কার– এসবের বাস্তব জ্ঞানও বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অদ্যাবধি উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে জ্ঞানাধিকার থাকতে হবে।

৮. উপযোগ ও সহযোগ বিষয়ে প্রায়োগিক সংবিধান ও সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টা কাম্য।

৯. সমাজ সচেতনতা : মুসলিম-হিন্দু অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী ও তাদের জীবন পরিচিতি জানা আবশ্যক।

১০. জীবন চেতনায় সংস্কার-বিবর্তন মেনে নিয়ে কালধর্ম অনুসৃতি বুদ্ধিমানের কাজ।

১১. যার উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য-পরিবেশন সে পাঠক কে বা কারা– সুনির্দিষ্টভাবে জানতে হবে। কৃষক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, শিশু, বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, কর্মজীবী, জেলে, কামার, কুমার সাধারণ শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, নারী ও পুরুষ ইত্যাদি থেকে নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। শ্রেণী বিন্যাস ও স্পষ্ট শ্রেণী বিশেষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে করতে হবে।

১২. প্রবন্ধের আকৃতি বা দৈর্ঘ্য ও গভীরতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। কোথায় থামতে হবে, কোথায় বাড়াতে হবে– এর একটা পরিমিতি জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

১৩. বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তথ্য, তত্ত্ব ও ভাব-চিন্তা করে নির্ধারণ করতে হবে। তথ্যের সত্যতা যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দৃষ্টান্তসহ তার উল্লেখ প্রয়োজন। সত্যের মাহাত্ম্য ও যুক্তির সারবত্তা যাতে পাঠক হৃদয়ে উপলব্ধ হয়, সে কৌশলে ভাবের অভিব্যক্তির সার্থক প্রয়োগ প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য।

১৪. যথাযথ ভাব, সুন্দর ও লালিত্যপূর্ণ পংক্তি বা স্ট্যাঞ্জা কিংবা শব্দ, প্রয়োজনে উদ্ধৃত

করতে হবে। নানাবিধ ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষা আয়ত্তে থাকতে হবে। প্রয়োজনে যথাশব্দ প্রকাশ করতে না পারলে শ্রম ব্যর্থ হবে।

১৫. বর্ণনীয় বিষয়ের বিভাজন এবং পংক্তি কিংবা অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা একটি সুবিধাজনক কৌশল, যার প্রয়োগ বিধিসম্মত ও হৃদয়গ্রাহী হওয়া প্রয়োজন।

১৬. সাধারণতঃ ভূমিকা এবং গর্ভাংশে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদে বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেওয়ার পর পরিশেষে উপসংহারে শেষ কথা বলতে হবে।

১৭. যে কোন বর্ণনা বা বিবৃতি, যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হতে হবে।

১৮. সহজ শব্দ ছোট ছোট বাক্যে প্রয়োগ করে মনের ভাব প্রকাশ করবে; অতিকথন ও অনর্থক কলেবর বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ। এতে লেখার মান নিচে নেমে যায়।

১৯. অপ্রয়োজনে একাধিক অব্যয়াদি ব্যবহার করে বাক্যের দৈর্ঘ্য বাড়ানো বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক।

২০. ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে অলংকরণ করা যাবে। অনেক সময় যথাযোগ্য প্রয়োগে অলংকার দেহের সৌষ্ঠব বাড়ায়। কিন্তু অযথা অলংকারে ভারি করে ফেললে সুন্দরী রমণীও অশোভনীয় হয়ে পড়ে। একথা মনে রেখে ভারি না করে সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত হালকা অলংকার জাদুমন্ত্রের মত কাজ করে।

২১. অনাবশ্যক ও অবান্তর কথার প্রয়োগে সারগর্ভ বক্তব্যও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে।

২২. ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে এবং সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে শব্দাড়ম্বর প্রকাশিত না হয়ে পড়ে।

২৩. বিয়ের অনুষ্ঠানে যুদ্ধের বাজনা যেমন উদ্ভট মনে হবে, যুদ্ধের মাঝেও তেমনি রাখালিয়া মেঠো সুরের লহরী বেমানান হবে। একথাটি প্রবন্ধ রচনার বক্তব্য পরিবেশনে মনে রাখতে হবে।

২৪. ভাষার দৈন্য কারো কারো কাছে 'দৈন্যতা' এবং 'উৎকর্ষ' কোথাও বা 'উৎকর্ষতা' হয়। এধরনের প্রয়োগে ভাল প্রবন্ধও ডাস্টবিনে ফেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এঁরা লেখেন 'আপামর জনসাধারণ'– লেখেন 'জঘন্য' লেখেন 'যৌনকর্মী' ইত্যাদি। নিজেকে ও ভাষাকে হেয় করার জন্য এর চাইতে নিকৃষ্ট উপাদান ও অশ্লীলতা আর নেই।

আমার শেষ কথা, অবশ্য সাহিত্যে শেষ কথা বলে কিছু নেই, 'ধান ভানতে শিবের গীত'– যেখানে যা মানায় না, সেখানে তার অবতারণা সাধারণ-অসাধারণ সকল পাঠকই দু'হাতে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। একথা মনে রেখে যা সম্ভব, যা বিশ্বাস্য তার অনুশীলনই বাস্তবানুগ। এর ব্যতিক্রম পরিত্যাজ্য।■

লেখক-পরিচিতি : ড. কাজী দীন মুহম্মদ– বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক এবং শিক্ষাবিদ।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২২শে নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম অবদান

মোশাররফ হোসেন খান

■

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আর একটি শতাব্দী অতিক্রম করলো। শুধু কালের দিক থেকেই নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস– দীর্ঘতম এক ইতিহাস। এই ইতিহাসের সাথে যুক্ত হয়ে আছে মুসলিম অবদান প্রসঙ্গটিও। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের পরিবর্তে মুসলিম শাসন যখন বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকেই সূচিত হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন :

“১২০৩ খ্রীষ্টাব্দেই তুর্কী বীর ইখতিয়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী হিন্দুরাজা লক্ষণ সেনকে লখনৌতী হইতে বিতাড়িত করিয়া, বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।”

মূলত ১২০৩ থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রযাত্রা শুরু। আর পলাশীর বিপর্যয়, অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত– এই সাড়ে পাঁচশ’ বছর বছর ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত অর্থে স্বর্ণকাল। এরপর ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে আবার নেমে এলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর ঘনঘোর কাল মেঘ। এই অশুভ কাল মেঘে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূর্য আচ্ছাদিত ছিল ততদিন, যতদিন না তাদের শাসন ও শোষণের অবসান ঘটেছে।

পৃথিবীর আর কোনো ভাষার ওপর বাংলা ভাষার মত এত বিপর্যয় নেমে আসেনি। বাংলা ভাষা বারবার ধাক্কা খেয়েছে। আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তবুও আজ যখন পেছনের দিকে তাকাই, তখন দেখি– এই বাংলা ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ ফসলগুলো ফলেছে। সন্দেহ নেই, এর পেছনে অন্যতম অবদান– মুসলমানের। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে, এর মুখ্য কারণ হলো সচেতনশীল মুসলিম লেখক, বিগত কালের মুসলিম শাসক এবং ইসলাম প্রচারকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

মুসলিম শাসক ও ইসলাম প্রচাকরা বাংলাকে যেমন রাজনীতি এবং ধর্ম প্রচারের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেছেন, ঠিক তেমনি তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় তখনকার লেখকদের হাতে অবহেলিত এবং মৃতপ্রায় এই বাংলা ভাষা নবজীবন লাভ করেছে।

পলাশীর বিপর্যয়ের পর মুসলিম শাসকরা যেমন ক্ষমতা হারালেন, সেইসাথে বাংলা ভাষাও হয়ে পড়লো অভিভাবকহীন। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থমালা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ইংরেজ ও ইংরেজ মদদপুষ্ট শিক্ষিত হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষা জিম্মি হয়ে পড়লো। সেইসাথে যুক্ত হয়েছিল সুযোগ সন্ধানী খ্রীস্টান মিশনারীদের বহুমুখী অপকৌশল।

মুসলমানদের চলছে তখন রাজনৈতিকভাবে চরম সংকটকাল। মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা তখনো তারা পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। এই সুযোগ হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং খ্রীস্টানরা মুসলমানদের সযত্নে লালিত বাংলা ভাষার শরীর থেকে তাদের ঐতিহ্যাশ্রিত শব্দকে ছুঁড়ে ফেলে সংস্কৃতনির্ভর এক ব্রাহ্মণ্য ভাষার জন্ম দিল। এই ভাষায় রচিত হলো তাদের যাবতীয় গ্রন্থ এবং তা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ করে ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, অভিধান, ব্যাকরণসহ পাঠ্যপুস্তকের ভাষাও হয়ে গেল সংস্কৃতনির্ভর। সত্য বলতে, এই ব্রাহ্মণ্য ভাষার কবল থেকে আজও আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত নই। হিন্দু ব্রাহ্মণরা সচেতনভাবে যে সংস্কৃত ভাষার বীজ বপন করে গেছেন, আজকের অনেকেই তো সেই ভাষাই চর্চা করে যাচ্ছেন। পশ্চিম বাংলার হিন্দু লেখকরা যে ভাষা এদেশের মানুষকে শিখিয়েছেন, এখনো এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ চেতনে-অবচেতনে সেই ভাষারই লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন।

অথচ আমাদের বুঝা উচিত, ভৌগোলিক দিক দিয়েই আমরা কেবল ভারত থেকে পৃথক নই। আমরা পৃথক– ভাষা, সাহিত্য, জাতি, বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং আবেগের দিক দিয়েও। ভারতের সাথে আমাদের পার্থক্য সামান্য নয়, বরং আকাশ-পাতাল। এই পার্থক্য চিরন্তন। এই পার্থক্য এবং প্রভেদ মনের, চিন্তার, বিশ্বাসের, আচার-অনুষ্ঠানের, ভাষা, ঐতিহ্যের কর্মের, নামের, জীবনাদর্শের, আদব-লেহাজের, সাহিত্য ও সংস্কৃতির।

পলাশীর প্রান্তরে মুসলমানদের যদি বিপর্যয় না ঘটতো, তাহলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হতো হয়তো বা অন্যভাবে। সংস্কৃত নয়, বরং বাংলা ভাষাই হতো হিন্দু-মুসলমানদের একক ভাষা। পলাশীতে আমরা কেবল ক্ষমতাই হারাইনি– আমরা

হারিয়েছি আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং আমাদের গৌরবগাঁথা ঐতিহ্যিক ধারা।

বাংলা ভাষার ওপর বারবার আঘাত এসেছে, তবুও শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই, এই ঐতিহ্যবাদী মুসলিম লেখকরাই আবার ঠিকই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাল ধরে এগিয়ে গেছেন। আর আজ, পেছনে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ঐতিহ্যবাদী সেইসব সংগ্রামী অগ্রজেরা আমাদের জন্য নির্মাণ করে গেছেন এক একটি আলোকিত পর্বত।

বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম অবদান

প্রথমে আসা যাক বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে। এস, ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) আমাদের ভাষা সম্পর্কে বলছেন :

"আমাদের স্বাভাবিক ভাষা কি? বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গালা যে বাঙ্গালী হিন্দুর বাঙ্গালা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। আর এই প্রভেদ অহেতুক নয়। এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক এবং কালচারগত কারণ বর্তমান আছে, সেইসব কারণের দরুণ এক সময় পুঁথির ভাষা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবশ্য এখন আমাদের ভাষাকে অনেকটা সহজবোধ্য করতে হবে। আমির হামজার দাস্তানের ভাষা আমাদের সাহিত্যে আর চলবে না। আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভাষার অনুকরণ করে সরলতার পথে অগ্রসর হবো। পরে হয়তো হিন্দু ও মুসলমানের দুই উপভাষায় মিলে ব্যাপকতার এক ভাষার সৃষ্টি করবে। তবে সে পরিণতি নির্ভর করবে আমাদের হিন্দু বন্ধুদের উপর, কেননা তাঁদের উপভাষা গ্রহণে এক্ষণে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অগ্রসর হয়েছি। তাঁরা এখন এগিয়ে অর্ধ পথে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। সাহিত্যে কাজ হচ্ছে ব্যক্তির, জাতির, বিশ্বমানের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-সমবেদনা প্রভৃতি অনুভূতিকে, মানুষের অন্তরের অন্তরতম সত্যকে, সুন্দর সরল মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করা। তবে প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক যুগের সাহিত্যের দেশগত, জাতিগত, যুগগত, বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে এবং প্রত্যেক সমাজের মধ্যে এইসব বিশেষত্ব আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। বিশ্বমানবতার সবচেয়ে বড় সমর্থক হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। বিশ্বমানবতার বিষয় নিয়ে যত লিখেছেন, আর কেউ বোধ হয় তত লেখেননি। তাঁরই লেখা পড়ে এবং বক্তৃতা শুনে একদল দেশপ্রেমিক আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছেন, আর তাঁরা ইসলামিক সভ্যতাকে সমন্বয় করে নতুন একটা কিছু গড়বার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্র নাথের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এসব করছেন, তিনি অশেষ কষ্ট করে ভারতবর্ষ থেকে বড় বড় পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদ্র বালী দ্বীপে যাচ্ছেন হিন্দু কালচারের পুনরুত্থানের জন্য; নটরাজের পালা লিখছেন, বাঙ্গালী ছেলেদের হিন্দু পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা শেখাবার জন্য বেদমন্ত্র পাঠে ব্রাহ্ম রবীন্দ্র নাথের জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু আদর্শকে জাগিয়ে রাখবার জন্য। যে রবীন্দ্র নাথ একটি প্রবন্ধ লিখলে দশবার তাতে উপনিষদের উল্লেখ করতে ছাড়েন না,

তাঁরই নির্দেশিত পথের অনুসরণ করে আমাদের সমাজের কতিপয় সাহিত্যিক ইসলামিক কালচারের শত্রুতা সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!"

এরপর তিনি দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেছেন :"আমাদের সাহিত্য, আমাদের মানবতা, আধুনিক পরিভাষায় বিশ্বমানবতা প্রকাশ পাবে। সে সাহিত্যে প্রকাশ পাবে মুসলিম কালচারের অনুসারী আমরা, সে সাহিত্যে প্রকাশ পাবে বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, আর বাঙ্গালা দেশ আমাদের মাতৃভূমি। আমাদের সাহিত্যিকদের লেখা থেকে এই তিনটি সত্য সুপ্রকট হয়ে উঠুক।

সাহিত্যে দাস মনোবৃত্তি ও পরাজিতের মানসিকতা দূর করে যথেষ্ট সাহসের এবং নতুন আত্মসম্মানপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় আমাদের দিতে হবে। যে দিন বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানের লেখায় এই রকম আত্মসম্মানের পরিচয় পাবো, সেদিন সত্যই আমাদের মনে আনন্দের হিল্লোল উঠবে।

আমাদের বর্তমান মানসিক এবং নৈতিক দুর্দশার জন্য প্রধানত দায়ী হচ্ছে আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রণালী। হিন্দু ছাত্র হিন্দুর উপযোগী শিক্ষা পেয়ে থাকে; মুসলমানদের উপযোগী শিক্ষা পায় না। আমাদের ছেলেরা মুসলমানদের উপযোগী শিক্ষা যাতে লাভ করতে পারে এবং তা নিয়ে তারা যাতে গৌরব অনুভব করতে শিখে তার আয়োজন করতে হবে। আর বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি যত শীঘ্র সম্ভব করতে হবে। এই দুইটি কাজ যদি আমরা সুচারুভাবে করতে পারি, তাহলে জাতীয় আদর্শকে তার উপযুক্ত আসনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো।

আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমাদের সমাজের তরুণ এবং তরুণীদের উপর। আর কারো উপর নয়। তাঁরা যদি জাতীয় সাহিত্য রচনায় তাঁদের কর্তব্য পালন করেন, তাঁরা যদি সমাজকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন, তাহলে তাঁদের আন্তরিক সেবায় সব দু:খ, সব দৈন্য আমাদের কেটে যাবে, আশার এবং আনন্দের গানে জীবন আবার আমাদের মুখরিত হবে।"

বলা জরুরি যে, ওয়াজেদ আলীর মতো অসংখ্য সচেতন লেখকের শ্রমবাহী প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা ফিরে পেয়েছে তার প্রকৃত প্রাণশক্তি। বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম লেখকদের অবদানই মুখ্য।

দুই.

খুব সঙ্গত কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আমাদের বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্রিক ও ঐতিহ্যিক উদ্ভাসের। আর এ জন্যই ভাষার লড়াইটির বীজ সংগোপনে পুষ্ট হচ্ছিল ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে, তারপর ব্যাপক-বিশাল বৃক্ষেই সেটা রূপ নিল ১৯৫২ সালে। আর এখন তো বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতার আকাশও স্পর্শ করেছে এই বাংলা ভাষা।

করেছে বটে, কিন্তু সেই সাথে এটাও তো সত্য, যতটা হবার কথা ছিল বাংলা ভাষা খোদ

আমাদের দেশেই এখনো সেই মর্যাদার আসন পায়নি, সেই ব্যাপ্তি এবং বিকাশও ঘটেনি– বেদনার বিষয় হলো, যে স্বপ্ন, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা আর যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষার জন্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বাংলার সেইসব বীর সৈনিক– এতটা বছর পরও সেই স্বপ্নের অধিকাংশই অপূর্ণ রয়ে গেছে। কিন্তু কেন? এর জবাব কিছুটা পাওয়া যায় ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের যন্ত্রণাবিদ্ধ কিছু উচ্চারণের মাধ্যমে। তিনি বলেন :

"ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৪৮ সনের মহা আন্দোলনে তখনকার সরকার বাঙলাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সনে তা পাকিস্তানের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতদসত্ত্বেও দীর্ঘ ৩১ বছর পরে ১৯৮১ সনেও আমরা বাঙলাকে সরকারী ভাষা কিংবা সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে চালু দেখতে পাচ্ছি না।

১৯৫২ সনের প্রবল আন্দোলনে এই ভাষার জন্য অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তারপরও মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট, আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত সরকার বিভিন্ন সময়ে এই দেশকে শাসন করে গেল। বিভিন্ন সরকার বাঙলা চালুর জন্য বহু সিদ্ধান্ত ও সার্কুলার জারি করল। ভাষা আন্দোলনকে পুঁজি করে অনেকে নেতা বনে গেছেন– বহু সরকারের পতনও হয়। ভাষা আন্দোলনের ফলেই স্বাধীনতা আসল, তবুও রাষ্ট্রভাষা ও সর্বত্র শিক্ষার মাধ্যমরূপে এর প্রতিষ্ঠা হয় না– কিন্তু কেন?

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, বাঙলা আমদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে আমরা গভীরভাবে ভালবাসি, এই ভাষায় কথা বলি– আর এই ভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ও শিক্ষার সর্বস্তরে সব কাজ চলুক– এই আমরা মনে প্রাণে কামনা করি। বিভিন্ন সরকার তা কামনা করেছে– বর্তমান সরকারও তাই করছে তবু এই ভাষা চালু হয় না কেন?

'৫২ সনের পূর্বে '৪৮ সনের অনুসরণে ১১ই মার্চ ভাষা দিবস হিসেবে সসম্মানে পালন করা হত। '৫২ সনের পর প্রতি বছর মহাসমারোহে ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রতিপালিত হচ্ছে। নেতা উপনেতা থেকে শুরু করে আমরা প্রায় সকলেই এই দিবস সম্মানের সাথে পালন করি। অসংখ্য সভায় বক্তৃতা করি ও পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য লেখালেখি, ভাষার নামে বেদি পূজা করতেও দ্বিধা করি না। এতদসত্ত্বেও যে ভাষার জন্য এত কিছু, তার কোন হিল্লা হল না। এটা যেমন অতীব লজ্জাকর তেমনি দু:খজনকও বটে।

এই অপমানজনক পরিণতির কারণ হিসাবে সরকারের গাফলতি, আমাদের অবহেলা নেতাদের মুনাফেকী এবং আরো অনেক কিছু বলা যায়।– বলাও হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন ফল লাভ হয় নাই।"

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও সরকারী কার্যক্রমের সর্বস্তরে এখনও বাংলা চালু নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন : "বহু উচ্চ ও মধ্য পদস্থ অফিসারের সাথে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সরকারী নির্দেশ এবং প্রবল জনমত থাকা সত্ত্বেও কেন তারা বাঙলাকে সরকারী ভাষারূপে চালু করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা জানতে চাইলে তারা বলেন :

'বাঙলায় আমরা লিখতে চাই– কিন্তু কার্যত: বাঙলায় লিখতে উৎসাহ বা সাবলিলতা বোধ

করি না। এর প্রধান কারণ : বাঙলা লিখতে গেলে আমরা প্রায়ই বানানে ও শব্দ চয়নে মারাত্মক ভুল করে থাকি। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কিছু লিখলেও তা শুদ্ধ হল কিনা তাতে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ থাকে। লেখা নির্ভুল ও সুন্দর হল বলে আমাদের আস্থা জন্মে না। ফলে দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে ২/১ দিন বাঙলায় লেখার চেষ্টা চললেও তাতে আর এগোববার উৎসাহ বা স্থিরতা থাকে না।'

এই সমস্যা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমাদের বাঙলা ভাষায় ও বর্ণমালায় এমন বহু বিষয় বর্তমান যা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়– জটিল অনাবশ্যক ও দুর্বোধ্যও বটে। এই সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত বাঙলাকে কার্যত: চালু করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।... একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাঙলা ভাষায় প্রচলিত বহু শব্দের বানানের সংগে উচ্চারণের কোন মিল নেই। অর্থাৎ এগুলো ধ্বনিভিত্তিক নয়। অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হল বানান হবে ধ্বনিভিত্তিক। কারণ বানান ব্যবহৃত বর্ণগুলো তো উচ্চারণের চিহ্ন বই আর কিছু নয়। সংস্কৃতের নিয়ম, তার শব্দ ও বর্ণ অন্ধভাবে ও নির্বিচারে অনেকটা জোর করে 'বাঙলায়' আমদানী করার ফলে এই মারাত্মক ত্রুটি অনাবশ্যকভাবে আমাদের ভাষায় ঢুকে পড়েছে। বানান ধ্বনিভিত্তিক না হলে লেখায় ভুল তো হবেই। তখনকার বৃটিশবিদ্বেষী মুসলমানদের প্রভাব ও ঐতিহ্য থেকে বাঙলা ভাষাকে মুক্ত করার মানসে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আমলে ফোর্ট উইলিয়াম তথা হিন্দু কলেজের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে সহজ বাঙলা ভাষা ও বর্ণমালাকে সংস্কৃতায়িত করা হয়েছিল। (দ্র. ড. শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বাঙলা সাহিত্যের কথা : দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৬৫) যদিও সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাঙলাকে ছোটলোকের ভাষা বলে ঘৃণা করতেন। তারা ফতোয়া দিয়ে রেখে ছিলেন বাঙলা ভাষায় লিখলে পড়লে রৌরব 'নামক নরকে' যেতে হবে। বাঙলাবিদ্বেষী এই সংস্কৃত পণ্ডিতেরাই বৃটিশের অনুগ্রহ লাভের জন্য বাঙলা চর্চা শুরু করেন এবং তাদের বর্ণগত সুবিধা ও বৃটিশের ইচ্ছানুসারে বাঙলাকে সংস্কৃতায়িত করে কৃত্রিম ও জটিল করে তোলেন।"

বাংলা ভাষা নিয়ে যেমন ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলন ও ভাষা সৈনিকদের ইতিহাস নিয়েও চলছে এক ধরনের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র। এখন দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত ভাষা সৈনিকদের আড়ালে রাখার এক ন্যাক্কারজনক কূটকৌশল। সেইসাথে এমন অনেককেই ভাষা সৈনিক বানানো হচ্ছে– প্রকৃত অর্থে ভাষা আন্দোলনের সাথে যাদের দূরতম কোনো সম্পর্কও ছিল না। ভাষা আন্দোলনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এধরনের নিষ্ঠুর পরিহাস জাতির জন্য সত্যিই লজ্জার বিষয়! এ সম্পর্কে ভাষা সৈনিক এম. শামসুল আলমের (১৯২৬-১৯৯৪) উচ্চারণ আমাদের চিন্তার দুয়ারটি কিছুটা হলেও আলগা করে দিতে পারে।

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিলো– এ প্রশ্নের জবাবে তিনি সেদিন ভাষা আন্দোলনের একটি উপেক্ষিত ইতিহাসই বিধৃত করে বলেছিলেন :

"ভাষা আন্দোলনের একুশে ফেব্রুয়ারীর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলে ভাষা আন্দোলনকে বায়ান্নোর একুশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত হবে না। এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল

'৪৭ থেকে। এমনকি দেশের শিক্ষাবিদগণ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি বিভিন্নভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা এবং সংগঠন না থাকায় ভাষার প্রশ্নটি একটি আন্দোলনের রূপ পেতে পারেনি। এই দুরূহ কাজটি করতে এগিয়ে এসেছিলো 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান; ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম ও অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রের উদ্যোগে এই মজলিস গঠিত হয়। তবে অধ্যাপক আবুল কাসেমই মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে '৪৮-এর এগারই মার্চের আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। সত্যি বলতে কি, এগারই মার্চের আন্দোলন না হলে, বায়ান্নোর আন্দোলন হতো না। এগারই মার্চ রাষ্ট্র ভাষার দাবি নিয়ে যে সংগ্রাম শুরু হয় বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারীতে তা পূর্ণতা পায়। বস্তুত '৪৮-এর এগারই মার্চ ছিলো ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সংঘাত ও গণ বিক্ষোভ এবং এরই ফলশ্রুতিতে তৎকালীন সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। কাজেই বলা যায়, ভাষার দাবি উঠাবার নৈতিক বল যতটুকু এসেছিল, তা এগারই মার্চের চুক্তির ফলে সৃষ্ট। আর এই চুক্তি সংগঠিত হয়েছিল বলেই বায়ান্নোর আন্দোলনের সূত্রপাত্র।"

ভাষা আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরকে কেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে নেপথ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে– এ প্রশ্নের জবাবেও আমরা তাঁর খেদ এবং মর্মপীড়ার পাশাপাশি ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় পাই :

"ভাষা আন্দোলনে যারা মূল নেতৃত্বে ছিলেন তাঁরা অনেকেই আন্দোলনের ইতিবৃত্ত বর্ণনাকারীদের হাতে পড়ে নেপথ্যে চলে গেছেন। এক কথায় তাঁদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে নেপথ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এ আন্দোলনে যাদের কোন উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না তাদের অনেকেই প্রথম সারিতে সুকৌশলে স্থান করে নিয়েছেন। অনেকেই নিজ নিজ মতবাদী লোকদের ঠেলে উপরে দিচ্ছেন। যাঁরা সত্যিকার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কস্মিনকালেও তাঁদের কথা আলোচনায় আসে না। কিন্তু আমাদের একথা মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। কিন্তু দু:খ হয়, এ কথা ভেবে– যে জাতি তার প্রকৃত কর্মীদের ত্যাগের ও অবদানের ন্যায্য স্বীকৃতি দেয় না, সে জাতি কখনই একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।"

তিনি আমাদের এই মহান ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের অসম্পূর্ণ দিকটিকে তুলে ধরে বলেছিলেন :

"ভাষা আন্দোলনের যে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্থাৎ সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা, তা আজও হাসিল হয়নি। অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজ, উচ্চ শিক্ষার অনেক স্তরে এখনও ইংরেজীর পুরো দাপট। দুনিয়ার সব উন্নত দেশে নিজেদের ভাষায় উচ্চতর গবেষণা চলে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাই। কিন্তু সে আশা আমাদের আজও পূরণ হয়নি। প্রয়োজনীয় বই-পত্র বাংলায় না থাকাতে ছাত্ররা বিকৃত বাংলার নোট পড়ে স্বপ্ন জ্ঞানের

অধিকারী হয়। নতুবা ইংরেজী জ্ঞানের অভাবে অশুদ্ধ ইংরেজীতে উত্তর লিখে শিক্ষা জীবন বিপণ্ন করে। ফলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ হয় অন্ধকার। অন্যদিকে কিন্ডার গার্টেন স্কুলে পড়ে বিত্তবান লোকের ছেলেমেয়েরা সর্বত্র বড় বড় পদ এমনকি নেতৃত্বের অধিকারী হচ্ছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে শ্রেণী বিশেষের ভবিষ্যৎ সৃষ্টির চিন্তা আমরা কখনই করিনি। কাজেই একটি বিরাট প্রশ্ন এখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তা হলো, জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা কতটুকু আন্তরিক ও আগ্রহী? এ প্রশ্নের ভেতরই নিহিত আছে বাংলা ভাষাকে প্রকৃত মূল্য দেয়া।"

বাংলা ভাষা নিয়ে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে, সেই ষড়যন্ত্র আর কুটিলতার ঘূর্ণিপাকে এখনো সমান দোল খাচ্ছে আমাদের এই প্রিয়ভাষা– বাংলা। আমাদের হীনমন্যতা, অসচেতনতা, সম্যক উপলব্ধির অভাব এবং আত্মিক ও নৈতিক অধপতনের কারণে বাংলা ভাষা এবং ভাষা আন্দোলনের সঠিক চিত্রটিও আজ পর্যন্ত স্পষ্ট হতে পারলো না! এই ব্যর্থতা আমাদের বেদনার চূড়াস্পর্শী হলেও এটা একটি সত্য ইতিহাসেরই অপমৃত্যু! সুতরাং এখন জরুরি হয়ে পড়েছে সত্যানুসন্ধানী গবেষক, ইতিহাসবিদদের এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এগিয়ে আসার।

বাংলা ভাষা আন্দোলনে মুসলিম অবদান

বাংলা ভাষা আন্দোলনের বয়স ধীরে ধীরে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের ভাবতে হবে যে, ভাষা আন্দোলনের সময়কালটা ছিল একদিকে যেমন ঐতিহাসিক, তেমনি জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ফলেই এদেশে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর সেটা তো পেয়ে গেল আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি ও মর্যাদা। বাংলা ভাষার ইতিহাস সুপ্রাচীন। ভাষা আন্দোলনের বয়সও নেহায়েত কম হলো না! সঙ্গত কারণে আজ চোখ ফেরাতে হয় পেছনের দিকে, ভাষা আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোর প্রতি।

ভাষা আন্দোলন, এর প্রেক্ষাপট এবং প্রাসঙ্গিক ইতিহাস আমাদের সামনে স্বচ্ছ থাকা প্রয়োজন। যারা ভাষার দাবিতে সংগ্রাম করেছিলেন সেই সংগ্রামী সৈনিকদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে এখানে উপস্থাপন করা হলো। তাদের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে আমরা প্রকৃত অর্থে একটি সত্য ইতিহাসকে স্পর্শ করতে সক্ষম হব বলে মনে করি। সেই সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টিও এখানে পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। বোধ করি ভাষা আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভাষা সৈনিকদের উপস্থাপিত এইসব অকুণ্ঠ সত্য উচ্চারণ আমাদেরকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে তুলবে।

বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন সম্পর্কে আতাউর রহমান খান বলেন : "না, ভাষা আন্দোলনের শুদ্ধ ইতিহাস লেখা হয় নাই। শিল্পী সাহিত্যিক যারা একুশের পদক লাভ করেছেন, তাদের উচিৎ এ বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তা ছাড়া যারা অংশগ্রহণ করেছেন কিংবা প্রত্যক্ষদর্শী তারাও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।"

ভাষা আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব সম্পর্ক তিনি বলেন : "মূল নেতৃত্বের অনেকেই একদম বাদ পড়ে যাচ্ছেন ভাষা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত বর্ণনাকারীদের হাতে। পক্ষান্তরে যাদের কোন উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না তারা অনেকেই আজ প্রথম সারিতে এসে স্থান দখল করেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদী লোকদের ঠেলে উপরে তুলে দিচ্ছেন। সত্যিকার যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের উল্লেখও নাই।... অনেকেই তখন জন্মগ্রহণ করেননি। ঘটনার কথা লোকমুখে শুনে কিংবা ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে বিকৃত ইতিহাস সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন বহু সংখ্যক লোক। নেতৃত্ব দিয়েছেন অপেক্ষাকৃত অনেক কম সংখ্যক লোক। বিদ্বেষবশত এদের অনেকেকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বাইরে। তাদের অনেককেই কেউ আজ চেনে না। দুই এক যুগ পর আর সত্যিকার নেতৃত্বের খোঁজও পাওয়া যাবে না। ভূঁইফোঁড়েরাই তখন জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন : "ঐ সময়ের কিছু কিছু ঘটনা মনে অত্যন্ত রেখাপাত করেছিল। এখানে মনে পড়ছে, ২১শে ফেব্রুয়ারীর দুই-তিন দিন পরে আমরা কয়েকজন চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে আজিমপুর কলোনীতে গিয়েছি। এ সময় ফ্ল্যাটের অনেকে আমাদের দেখে উপর থেকেই স্বেচ্ছায় টাকা-পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছেন। অনেক মহিলা তাদের কানের দুল, হাতের আংটি, গলার হারও ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। এ থেকেই বুঝা যায় যে একুশের আন্দোলন তাদের হৃদয়ে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল!

এ সময়েরই আরেকটি ঘটনা। ২২শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল। আজিমপুর কলোনীতে সেক্রেটারীয়েটে চাকুরীতে অফিস গমনেচ্ছু স্বামীকে বাধা দিচ্ছেন তার স্ত্রী। মহিলা বলছেন : ওরা আমাদের ছেলেদের উপর গুলী চালিয়েছে। এর প্রতিবাদে কেউ অফিসে যাচ্ছে না। তুমিও যেও না। কিন্তু স্বামীটি সরকারী রোষের ভয়েই হোক আর অন্য যে কোন কারণেই হোক, স্ত্রীর কথা মানতে পারছিলেন না। তিনি ঘর ছেড়ে বেরুবার উপক্রম করতেই স্ত্রী পথ আগলে দাঁড়ালেন! বললেন : এ খুনী সরকারের চাকুরী তুমি ছেড়ে দাও। তা যদি না পারে তবে অন্তত আজকের দিনটিতে যেও না। কিন্তু স্বামী তবুও অফিসগামী দেখে মহিলাটি চরম হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলেন : দ্যাখো, তুমি এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলে আমিও ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবো। এরপর আর স্বামী বেচারার অফিস যাওয়া হলো না।"

বিপারপতি আবদুর হমান চৌধুরী ভাষা আন্দোলনে তার সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে বলেন :

"১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র হিসাবে আমি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলাম। তাছাড়া আমি ছিলাম সলিমুল্লাহ হল ইউনিয়নেরও সহ-সভাপতি। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব, ভাষা, কৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো বাঞ্ছিত লক্ষ্য ও উল্লেখ্য।"

তাঁর মতে : "১৯৪৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তিই ছিলো ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত সংস্থা তমদ্দুন মজলিস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। তখন

কমিউনিস্ট ছাত্রদের সংখ্যা এত মুষ্টিমেয় ও নগণ্য ছিল যে, চালিকা শক্তি হওয়া তো দূরের কথা, কোন ফ্যাক্টরই তারা ছিল না।"

ভাষা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো : "ভাষা আন্দোলনের বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল মানুষের সত্যিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিত করা যা আজ পর্যন্ত অর্জিত হয়নি।"

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন সম্পর্কে তিনি বলেন :

"ভাষা আন্দোলনের উপর লেখা সব বই দেখা বা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। হবে দু'চারটা যতোটুকু পড়েছি তাতে মনে হয়েছে, লেখক তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতেই তৎকালীন ঘটনা বিচার ও লিপিবদ্ধ করেছেন। বস্তুনিষ্ঠর অভাব কোথাও আছে বলে আমার মনে হয়েছে। তবে তাদের উদ্যম ও প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমার মত হলো কোন একক লেখকের প্রচেষ্টায় এ গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করা দুরূহ ব্যাপার। তাই বাংলা একাডেমী, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা ইসলামিক ফাউন্ডেশন– জাতীয় কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে একটা বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যভিত্তিক ও সার্বিক ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নেয়া উচিত।"

ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম বলেন : "১৯৪৮ সনের ভাষা আন্দোলনে সরকারের সংগে ভাষা সংগ্রাম কমিটির যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়– তাতে বাঙলা অফিস আদালতের ভাষা ও সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তার বহুদিন পর ১৯৫৬ সনেও পাকিস্তানের সংবিধানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে।

ভাষা আন্দোলনের ফলে কাগজে-কলমে বাঙলা শিক্ষার মাধ্যম, আইন-আদালতের ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল বটে, কিন্তু প্রতি বছর ভাবপ্রবণতার মধ্যে মহাসমারোহে একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালন সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে– এমনকি যুক্তফ্রন্টের আমলেও এই স্বীকৃতিকে কার্যকরী করার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। '৪৮-এর আন্দোলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত বাঙলা একাডেমীতে এবং আইন সভার কার্যক্রম ও কার্যবিবরণীও ইংরেজীতে পরিচালিত হত। বাঙলা একাডেমীর কার্যকরী সংসদের সদস্য হিসাবে আমি এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় বাঙলার মাধ্যমে কাজকর্ম পরিচালনার প্রস্তাব পাস হয়। ১৯৫৪ সনে আমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। তখন বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও আইন সভার কার্যবিবরণী বাঙলায় পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তফ্রন্টের নেতাদের অনিচ্ছা ও বাধা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অবিলম্বে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারী ভাষা হিসাবে বাঙলাকে চালু করার আমার প্রস্তাব আইন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাস করাতে সমর্থ হই। অবশ্য এর সাথে ১৯৫৪ সনে শেরে বাঙলা ফজলুল হক ও মাওলানা ভাসানীর মুখবন্ধ সমৃদ্ধ "একুশ দফার রূপায়ণ" নামক আমার বইটিতে সর্বস্তরে বাঙলাকে চালু করার সমস্যা ও তার সমাধান প্রদর্শন করেছিলাম।

এতকিছু সত্ত্বেও শিক্ষা বিভাগ কিংবা অফিস-আদালতে বাঙলা চালু না হওয়ায় বহু চিঠিপত্র ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকারের কাছে রাষ্ট্রভাষারূপে বাঙলাকে সর্বত্র চালু করার জন্য তাগিদ দিতে থাকি। তাছাড়া ১৯৪৯ সন থেকে আমার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক সৈনিকেও' এজন্য বারবার কঠোর সমালোচনা করে সর্বত্র বাঙলা প্রচলনের দাবি জানাতে থাকি।

মন্ত্রীসহ সরকারী মহল যে সময় বাঙলাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করার অনুপযুক্ততা আলোচনা করে বলতেন : বাঙলায় তো এখনো পর্যন্ত উচ্চতর ক্লাসগুলো– বিশেষ করে বিজ্ঞানের উপযুক্ত পাঠ্য বইও রচিত হয় নাই; এ ছাড়া টাইপ রাইটিং ও টেলিপ্রিন্টিং-এর মত অত্যাবশ্যকীয় কাজে বাঙলাকে সঠিকভাবে চালু করা যায় না। সেই সংগে তারা উপযুক্ত পরিভাষার অভাবের কথাও উত্থাপন করতেন। তার উত্তরে আমি মাতৃভাষা চালুর ব্যাপারে বিদেশের উদাহরণ ও অন্যান্য যুক্তি দিয়ে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করতাম : বৈজ্ঞানিক বিষয়সহ সবকিছু দৈনিক পত্র-পত্রিকায় বাঙলায় রিপোর্ট আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিভাষার সমস্যা দেখা দেয় না; কলেজ হাসপাতাল, আওয়ামী লীগ, ইত্তেফাক, অক্সিজেন, টেবিল, চেয়ারসহ হাজার হাজার অন্য ভাষার শব্দ যে বাঙলা ভাষার শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে তো বাঙলাকে সমৃদ্ধই করছে। আর সহজ-সুন্দর বাঙলা প্রতিশব্দ না থাকলে যে বিদেশী শব্দকে সহজরূপে বাঙলায় ব্যবহার করা উচিত, সে যুক্তি প্রদর্শন করে বলতাম : আপনাদের ওসব খোঁড়া যুক্তি দিয়ে বাঙলা প্রচলনকে বাধা দেয়া কোনমতেই উচিত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তির ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকায় মন্ত্রী ও সরকারী আমলারা তাকে আমল দেয়া সংগত মনে করতেন না।"

ভাষা সৈনিক নূরুল হক ভূঁইয়া ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেন :

"ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে লিখিত হয় নাই। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ১৯৪৭-৪৮ সনের আন্দোলনে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত ও সুদূরপ্রসারী সফলতা অর্জিত হয়, তাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা হয় নাই। আমি এখানে ১৯৪৭-৪৮ সালের আন্দোলনের সাথে ১৯৫২ সালের আন্দোলনের একটা তুলনামূলক বিবরণ দিচ্ছি।

(ক) ১৯৪৭-৪৮ সাল। বদরুদ্দীন উমর লিখিত "পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" নামক পুস্তকের বিবরণ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র ও অধ্যাপকের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। (২) ১৫ই সেপ্টেম্বর তারা "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" এই নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। (৩) ১লা অক্টোবর প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়। সেই মাসে ফজলুল হক হলে এ ব্যাপারে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। (৪) ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সাধারণ ছাত্র-সভা অনুষ্ঠিত হয়। (৫) ৭ই ডিসেম্বর

রেল কর্মচারীদের সভায়, এ. কে. ফজলুল হককে সভাপতি করার ব্যাপারে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীদের মধ্যে দারুণ গণ্ডগোল হয়। (৬) ১২ই ডিসেম্বর ভাষা আন্দোলন বিরোধিরা পলাশী ব্যারাক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এসে ছাত্রদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ও কয়েক রাউণ্ড গুলী ছুঁড়ে। এর প্রতিকার দাবিতে এক বিরাট মিছিল মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে সেক্রেটারিয়েট যায় এবং মন্ত্রী আবদুল হামিদ ও সৈয়দ আফজলের সমর্থন আদায় করে। (৭) ১৩ই ডিসেম্বর সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা পূর্ণ হরতাল পালন করেন। সেদিন থেকে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। (৮) ২৩শে ফেব্রুয়ারী '৪৮ পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর সংগে বাংলাকে পরিষদের ভাষা করার ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাব বাতিল হয়। ফলে (৯) উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। (১০) ২৬শে ফেব্রুয়ারী তমদ্দুন মজলিসের ডাকে পূর্ব পাকিস্তানের 'প্রতিবাদ দিবস' পালন ও ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সে দিনই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপে বহু ছাত্র-জনতা আহত হয় এবং কিছু সংখ্যক লোককে জেলে প্রেরণ করা হয়। এই বিক্ষোভ ও গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীগণ তমদ্দুন মজলিসের সংগে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আসেন। (১১) ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। (১২) ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকায় পুলিশের সংগে ছাত্র জনতার তীব্র লড়াইয়ে গুলী, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও পুলিশের অত্যাচারে ২০০ আহত ৯০০ জন ধৃত ও ৬৯ জনকে জেলে বন্দী করা হয়। (১৩) ১২ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ঢাকা ও অন্যত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। (১৪) ১৫ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের সাথে তথ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেবের ৮ দফা ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। (১৫) উক্ত দিনে ছাত্র-জনতার এক বিরাট মিছিল জগন্নাথ হলে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের সভার দিকে পুলিশের বেরিকেড ভেদ করে অগ্রসর হয় ও পরে উক্ত চুক্তির কথা জানতে পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। (১৬) ১৯শে '৪৮ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিরাট জনসভায় জিন্নাহ সাহেব রাষ্ট্রভাষা 'উর্দু হবে' বলায় বিভিন্ন দিক থেকে নানা প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

২৪শে মার্চ কার্জন হলেও জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদে 'নো' 'নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

এরপর ১৯৪৯ এবং ৫১ সালে ১১ই মার্চ দিনটি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। বস্তুত নাজিমউদ্দিন সাহেব চুক্তির ৩নং দফায় পরবর্তী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় "বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপনের" অঙ্গীকার করায় ভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

এই চুক্তিতে ২৯শে ফেব্রুয়ারী '৪৮ থেকে ভাষার প্রশ্নে গ্রেফতারকৃত সকলকে মুক্তিদান

অর্থাৎ আমাদের সকল দাবি মেনে নেওয়ায় ছাত্র-জনসাধারণ অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বস্তুত এ ছিল এক অনন্য বিজয়। এ ব্যাপারে তৎকালে কলকাতার আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের "ইত্তেহাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পকদীয় নিবন্ধ থেকে আন্দোলনের প্রমাণ মিলে। তিনি লিখেছিলেন : "যে বিরাট শক্তি ও দুর্জয় বিরোধিতার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীগণ যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।" ১৯৪৭-৪৮ সালের উপরোক্ত আন্দোলনের সাথে ১৯৫২ সনের আন্দোলনের তুলনা করা যাক–

(খ) ২৬শে জানুয়ারী '৫২ নাজিমুদ্দিন সাহেব পল্টন ময়দানে আবার ঘোষণা করলেন যে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, এরপর–

(১) বার লাইব্রেরীতে ৩০ শে জানুয়ারী '৫২ সর্বদলীয় সম্মেলনে পুনরায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং কাজী গোলাম মাহবুব এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। এই সভায় '২১শে ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ দিবস' পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) ৪ঠা ফেব্রুয়ারী '৫২ স্কুল কলেজ ধর্মঘট পালিত হয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা হয়। (৩) ১২ই ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস পালন করা হয়। (৪) ১৯শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী হয়। সেই দিন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পরদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয় ও পুলিশ গুলী বর্ষণ করে। এ গুলী বর্ষণে সেদিন ও পরের দিন রফিক, বরকত, জব্বার ও সালামসহ কয়েকটি অমূল্য প্রাণ শাহাদাত বরণ করেন। উপরোক্ত ঘটনায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে ১৯৪৭-৪৮ সনের ৬-৭ মাসের আন্দোলনের ইতিহাস কত ঘটনাবহুল এবং কি বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। অন্যদিকে, ১৯৫২ সনের আন্দোলনে শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাড়া বিরাট আন্দোলন বা ঘটনাবহুল দিন নেই। ঐদিন ছাত্র-জনতার বিক্ষুব্ধ মনোভাব যা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে ও পরে শহীদের রক্তে বিস্ফোরণ ঘটে। কাজেই আসল আন্দোলন ছিল ১৯৪৭-৪৮ সনে এবং তাই-ই পরিণতি পায় ১৯৫২ সনের কয়েক দিনের আন্দোলন ও ২১শে ফেব্রুয়ারীর বিস্ফোরণের মাধ্যমে। তবে একথা বলে আমি '৫২-এর আন্দোলনকে অবশ্যই ছোট করতে চাইছি না। বস্তুত '৫২-এর আন্দোলনের ফলেই বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখ্য ইতিহাসে ১৯৪৭-৪৮ স্যালের আন্দোলনের গুরুত্বকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় নাই। এ ব্যাপারে সেদিনের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য নিয়ে সঠিক ইতিহাস রচনা করা আজো সম্ভবপর।"

ভাষা আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব সম্পর্কে নূরুল হক ভূঁইয়ার স্পষ্ট অভিমত হলো : "বর্তমানে যারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বা দেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতির কর্ণধার তারা সেদিন ছিলেন হয় আন্দোলনের বিপক্ষে, নয় নীরব অথবা স্কুলের ছাত্র। কাজেই তখনকার মূল নেতাদের নাম উচ্চারিত হলে তাদরে খ্যাতির জৌলুস বা সৌভাগ্যের আলো স্তিমিত হয়ে আসে। তাই কোন লেখক এখনও লিখছেন যে ১৯৪৮ সনের ভাষা

আন্দোলন নাকি বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পারে নাই। ১৯৪৮ সনে তমদ্দুন মজলিস বাংলাকে সরকারী ভাষা করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রভাষার কথা বলেন নই। '৫২ সালেই নাকি প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা উঠে। তখনকার নেতারা নাকি ছিল মুসলিম লীগার। '৫২ সালের নেতারা নাকি ছিল প্রগতিশীল ইত্যাদি। তারা কয়েজন ছাত্র বা ছাত্র নেতাকেই আন্দোলনের নেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা '৫২ সালের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে (যারা এখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা) হয়ত নেতা বলতে অনিচ্ছুক।

এইভাবে মূল নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদেরকে যে নেপথ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। অথচ ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামক বইটিতে ২নং প্রস্তাব ছিল– 'পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি : বাংলা ও উর্দু।"

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল হক ভূঁইয়ার একটি স্মৃতি এ রকম : "দু'একটা ঘটনা আজও খুব মনে পড়ে। যেমন ১৯৪৮ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১১ টার দিকে যখন পুলিম হরতালকারী ছাত্র-জনতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমান মেডিকেল কলেজ) পূর্ব গেটের সম্মুখে লাঠিপেটা করে গ্রেফতার করছিল তখন জনৈক রাজনৈতিক নেতা (পরে বার্মার রাষ্ট্রদূত) তার কয়েকজন সঙ্গীসহ ঘোড়ার গাড়ী থেকে লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় নামছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম "আসুন অমুক সাহেব, গ্রেফতার হয়ে নেতা হওয়ার এই তো সুযোগ"। তখন তিনি বলেছিলেন "নূরুল হক সাহেব, আপনি একথা বললেন"? আমি বলেছিলাম "কি করব ভাই? ৪/৫ মাস ধরে তো বহু অনুরোধ করেছিলাম আমাদের সঙ্গে কাজ করতে, তখন তো আসেন নাই"? এতে উনার মুখ মলিন হয়ে যায়।"

ভাষা সৈনিক গোলাম মাহবুবের মতে : "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। ভাষা আন্দোলনের যে সমস্ত ঐতিহাসিক দলীল রয়েছে, যেসব ঘটনা ঘটেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে হবে। যাদের যে ভূমিকা ছিল তাদের সে সম্মান দিতে হবে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গেলে মনে রাখতে হবে যে, এ দেশের মানুষ আন্তরিক আবেগ-অনুভূতি নিয়েই আন্দোলনে নিবেদিত হয়েছিল দলমত নির্বিশেষে– তারই ফল হলো ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন যা আমাদের জাতি সত্তার বিকাশে মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে এবং প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপনের মাধ্যমে এ চেতনাকে ধরে রাখার একটি প্রয়াস চলছে।

দু:খের বিষয়, ভাষা আন্দোলনের যে কয়টি ইতিহাস বা দলিল প্রকাশিত হয়েছে তা পড়লে আমাদের বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। বেশিরভাগ লেখার মধ্যেই দেখা যায় যে, কমিউনিস্টরাই যেনো এ আন্দোলন করেছিলো এবং নেতৃত্বটাও তারাই দিয়েছেন। বামপন্থীদেরই আন্দোলনে মূল ভূমিকা ছিল সবাই এটা প্রচার করতে চান। অথচ কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকালে নিষিদ্ধ ছিল এবং ১৯৪৮ সালে তেভাগা আন্দোলনের কালে ইলামিত্রসহ বামপন্থীরা ব্যাপকভাবে নিগৃহীত হয়েছিল। মুসলিম লীগ

সরকার এ আন্দোলনকে ভিন্ন পথে চালিত ও তা স্তিমিত করার লক্ষ্যে এবং জনসাধারণের মধ্যে সংশয় সৃষ্টির লক্ষ্যে এটিকে বামপন্থী আন্দোলন বা ভারতীয় চক্রান্ত বলে অভিহিত করলে সে সময়ে অনেকেই তাদের সাথে সুর মিলিয়ে ছিলেন। সেই অপ্রচারের সুযোগ নিয়েই বামপন্থীরা আন্দোলনে নিজেদের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করছে। ভাষা আন্দোলনের জন্যে কারাগারে অতিবাহিত করেছে (যাদের কেউ কেউ আজ মৃত), যারা এ আন্দোলনে সার্থকভাবে নেতৃত্ব দান ও পরিচালনা করেছে, যারা জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছে, যারা অকুণ্ঠ চিত্তে এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছে।"

ভাষা আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব নিয়ে বিভ্রাট প্রসংগে তিনি বলেন : "কথাটা সত্য, যেমন শামসুল হক সাহেব। ১৯৪৯ সালে টাংগাইলে মুসলিম লীগ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তিনি এম এল এ নির্বাচিত হন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। আবুল হাশিম প্রমুখের সংগে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। কিন্তু এ অবদানের স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এ রকম আরো কিছু ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার ঘটেছে ও ঘটছে। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন।"

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণে গোলাম মাহবুব বলেন : "২১শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১২টা কি ১ টার দিকে আমি তখনকার মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে ছিলাম। তৎকালীন প্রাদেশিক এসেম্বলী হলের পাশে (বর্তমান জগন্নাথ হল) তখন ভীষণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। কারণ বেলা ৩টায় এসেম্বলীর সেশন শুরু হবে। তখন ঢাকার ডিসি ছিলেন রহমত উল্লাহ, সিটি এস.পি মাসুদ মাহমুদ। দু'জনেই অবাঙ্গালী। মেকিকেল কলেজে ছাত্ররা তখন ভীষণ উত্তেজিত। পুলিশের উপর ইট, পাটকেল ছোঁড়া হল। এ উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোষ্টেও সলিমুল্লাহ হলে। এসেম্বলী ভবন ছাত্রদের দ্বারা প্রায় ঘেরাও। মাঝে সশস্ত্র পুলিশ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় সকাল ১০/১১ টার দিকে লাঠিচার্জ করে। ততেই এ সমস্ত ছাত্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। লাঠি চার্জের ফলে (মেডিকেল কলেজের সামনে) ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ও হলে অবস্থান নেয়। ইট, পাটকেল ছোঁড়া আরম্ভ হয়। এতে পুলিশ সংখ্যা আরো বেশী রকমে বেড়ে গেল। যত পুলিশ আসে ততই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এর মধ্যেই আমি গুলীর শব্দ শুনি। তখন দেখি, একটি ছেলে মাথায় এবং বুকে গুলী লেগে ঢলে পড়েছে এবং তার প্রচণ্ড রক্তক্ষণ হচ্ছে। তাকে ধরে হাসপাতালে নিতে নিতেই সে মারা গেল। এ ছেলেটাই ছিল বরকত এবং সেই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ। এই মৃত্যু মানুষকে ক্ষণিকের জন্য হতবাক করে দিয়েছিল। এই রক্তই পরবর্তীতে ছাত্র-জনতাকে প্রচণ্ড শক্তি জুগিয়েছিল এবং একুশের রক্তপাতের ফলশ্রুতিতে ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী সারাদেশ হরতাল ও অসহযোগের মুখে অচল হয়ে পড়েছিলো মুসলিম লীগ, নূরুল আমিন, ঢাকার এস.পি ও ডিসি (অবাঙ্গালী), সবাই-ই ষড়যন্ত্রকারী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হলো।

আমি সেদিন অবাক হয়েছিলাম, একটি রক্তপাত কিভাবে একটি মহৎ এবং বিশাল আন্দোলনের জন্ম দিতে পারে। এ তো রক্তপাত নয়, এ হলো চেতনার উন্মোষে,

সংগ্রামের সলতের দাহিকা শক্তির আগুন জ্বালানো। সেদিন মনে হয়েছিল, আমেরিকার "মে' দিবসের মতোই এ দিনটিও নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ভাষা আন্দোলন এদেশে সূত্রপাত করেছিলো একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিস। এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম দিকে কোন রাজনৈতিক দলের কোন সম্পর্ক ছিল না। রাজনৈতিক দল হিসাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এর বিরোধিতা করেছিলো। কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রী, মিনিস্টারগণ ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন দিয়েছেন। তাদের কাছ থেকে আমরা নিয়মিত চাঁদা পেয়েছি। বামপন্থীরা তখন এই আন্দোলনের সঙ্গে কোন সহযোগিতা করেনি। এই আন্দোলনে কোন রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব ছিলো না।"

ভাষা সৈনিক ও সাংবাদিক সানাউল্লাহ্ নূরী বলেন : "১৯৪৭ সালের শেষের দিকে বাংলা ভাষা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং ১৯৪৮ সালে এটি গোটা বাংলাদেশে (তদানীন্তন পাকিস্তান) ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে স্কুল, কলেজে ধর্মঘট, ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় হরতাল এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভা অফিস ঘেরাও হয়। ১৯৪৮ সালে হাজার হাজার ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী হরতালের সময় পিকেটিং, মিছিল জনসভা করাকালে কারাবরণ করেন। ঐ সময় কেন্দ্রীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। যার আহ্বায়ক ছিলেন নূরুল হক ভূঁইয়া। ১১ই মার্চকে বাংলা ভাষার প্রতিবাদ দিবস হিসাবে সারা দেশব্যাপী আন্দোলন সূচিত হয়েছিলো। তারই প্রেক্ষাপটে ১১ই মার্চকে ভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫২ পর্যন্ত এই ১১ই মার্চ ভাষা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছিলো।"

ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর মনে করেন : "আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত স্থান নির্ণয়ের জন্য আমাদের জাতি সত্তা সম্বন্ধে একটু সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। যে কোন দেশের মতই বাংলাদেশের জাতি সত্তার দু'টি দিক আছে, একটি স্থানিক, অপরটি আদর্শিক। প্রথমটি আমাদের বাঙ্গালীত্ব, দ্বিতীয়টি মুসলমানিত্ব। যদিও আমাদের জাতি সত্তার মধ্যে এই দু'টি উপাদান মিশে একাকার হয়ে গেছে তবুও আমাদের জাতি সত্তাকে দুর্বল করে দেবার লক্ষ্যে আমাদের জাতিগত স্বাধীন অস্তিত্বকে সার্থক করে তোলা। এ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলে আমি মনে করি না, যদিও বাংলা ভাষাকে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা আমরা দিয়েছি। সম্পূর্ণ বিদেশী প্রভাবমুক্ত দেশ প্রেমিক সচেতন ও সংগ্রামী নেতৃত্বের অধানে সংঘবদ্ধ হয়েই সমগ্র জাতিকে ভাষা আন্দোলনের বৃহত্তর লক্ষ্য হাসিলের জন্য কাজ করে যেতে হবে।"

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো : "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। সত্যপ্রিয়তা ও নিরপেক্ষতা আজ বুদ্ধিজীবী মহলেও নিদারুণভাবে অনুপস্থিত, এ দুর্ভাগ্যের কথা। সঠিক ইতিহাস রচনার জন্য উচিত গোড়া থেকে শেষ অবধি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন সেসব ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিদের সমবায়ে একটি কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে এই ইতিহাসের রূপরেখা

প্রণয়ন কাজ করে যাওয়া। এর পরিবর্তে আজ চেষ্টা চলছে বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অবদানকে চাপা দিয়ে পূর্ব নির্ধারিত নীল নকশার ভিত্তিতে "ইতিহাস সৃষ্টি" করা। ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিকে পারস্পরিক মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে যে উদার, সহযোগী সম্পর্ক ছিল, প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্য সেই মনোভাবে প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।"

ভাষা আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন : "ভাষা আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তাদের অনেককেই ইতিহাসের নেপথ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে– এ অভিযোগ অনেকাংশেই সত্য। তা না হলে প্রথম একুশে পদকটি পেতেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, তিনি ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক সূত্রপাত করেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যেই ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভাষার দাবিতে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করেন যার শিরোনাম ছিল "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু।" ১৯৪৭-৪৮ সালে যারা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন, তাদের কেউ কেউ মারা গেলেও অনেকেই এখনও জীবিত রয়েছেন, যারা এ কথার সত্যতা স্বীকার করবেন। এভাবেই আরও বহু ব্যক্তি, যারা অমূল্য অবদান রেখেছেন ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের পরও বহুদিন পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে, তাদের অনেকে আজ গতায়ু, অনেকে এখনও বেঁচে রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের অনেকেরই যথাযথ স্বীকৃতি দানে আমরা কেন যেন কুণ্ঠিত।"

ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাসকে আড়াল করতে চাইলেও সেটা সম্ভবপর হবে না। কারণ সত্য সে তো উদ্ভাসিত হবেই। আমাদের কেবল প্রয়োজন সামগ্রিক চৈতন্যবোধ সকল সময় জাগরিত করে রাখা।

সংগ্রামের বাঁক পেরিয়ে

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলা শুধু একটি ভাষারই নাম নয়, এটি এখন একটি রক্তাক্ত ইতিহাসের নাম। শাণিত সংগ্রাম এবং বিজয়ের নাম। সেই সাথে আমাদের সাহস এবং তারুণ্যের নামও। বাংলাভাষাকে এখন আর উপেক্ষা করার দুঃসাহস রাখে কে?

এই যে আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাভাষা, এই ভাষা আজকের এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন হয়েছে বহু সংগ্রামের। অজস্র বাঁক পেরিয়ে তারপর সে পেয়ে গেছে তার আস্থার উপকূল। স্বপ্নের চাতাল।

বাংলাদেশে বাংলা ভাষা একটি স্মরণীয় ও বহুবর্ণিল অধ্যায়। সে এখন নিজেই একটি স্বতন্ত্র উজ্জ্বল ইতিহাস। এর মূলে রয়েছে মুসলিম অবদান। যখন এই বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকেই সূচিত হলো বাংলা ভাষার সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি।

আমাদের ভাষা আন্দোলনেও মুসলিম অবদানই ছিল মুখ্য। স্মরণ করা যাক, ১৯২০ সাল। ইংরেজ শাসন তখনো চলছিল। এই সময়ে কলকাতার শান্তি নিকেতনে একটি সভা হলো। কবি ররীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি। এই সভায় বাংলা ভাষার সপক্ষে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনকাড়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রবন্ধটি পরে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এছাড়াও বাংলার বহু লেখক বুদ্ধিজীবী বাংলা ভাষার মর্যাদা

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে লেখা ও বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। এভাবেই চলছিল বাংলা ভাষা আন্দোলনের মৃদু পা ফেলা, পা তোলা।

দিন যত গড়াচ্ছিল, ততোই দুর্বার হয়ে উঠছিল ভেতরের সুদৃঢ় সুপ্ত স্বপ্ন। বাংলা ভাষার আন্দোলনও ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করলো। এলো ১৯৪৭। ১৪ আগস্ট। এই দিনে ইংরেজমুক্ত হয়ে আমরা পেলাম একটি নতুন দেশ। নতুন পতাকা। ভারত আর পাকিস্তান– এই দু'টো অংশে বিভক্ত হলো মানচিত্র। আমরা হলাম পাকিস্তানের অধিবাসী। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুক্ত ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। মূলত তারাই ছিল শাসনকর্তা। এই সময়ে আমাদের পূর্ব বাংলার লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রসঙ্গটি আবার দুলে উঠলো প্রচণ্ডভাবে। কিভাবে একে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত করা যায় ? ভাবনা শুরু হলো। ভাবনা থেকে পরিকল্পনা। পরিকল্পনা থেকে আন্দোলনের শুরু। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি, তারপর বৃহৎ অংশ– এভাবেই ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো ভাষার দাবি।

ইংরেজ শাসনামলে এদেশে চেষ্টা চলেছিল রাষ্ট্রভাষা হিন্দি করার জন্য। আবার পাকিস্তান অর্জিত হবার পর পশ্চিম পাকিস্তান চেষ্টা চালালো উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভূমিষ্ঠ হয়েই আমরা যাদেরকে দেখি– তাদের ভাষা বাংলা। আমরা খেলি, বড় হই, পরস্পরের সাথে কথা বলি, ভাব বিনিময় করি– সে কেবল বাংলাতেই। তবে কেন বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা এখানে রাষ্ট্রভাষা হবে!

প্রশ্নটি ছিল যুক্তিসঙ্গত। ফলে বাংলাভাষার দাবিকে পশ্চিম পাকিস্তান তুচ্ছজ্ঞান করলেও আন্দোলনের অব্যাহত গতিকে তারা থামিয়ে দিতে পারলো না। তারা যতই বাঁধার সৃষ্টি করতে থাকলো, ততোই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে শুরু করলো আন্দোলনের গতি। সুতরাং ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই পূর্ব বাংলায় জ্বলে উঠলো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে এক প্রচণ্ড আগুন। তা ছিল এক উত্তাল স্রোতধারা। যা রুখবার মতো ছিল না কারোর।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই সোচ্চার হয়ে ওঠে বাংলাভাষার দাবি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলানা আকরম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, কবি ফররুখ আহমদ প্রমুখ সুধীজন বাংলার সপক্ষে লিখতে ও বলতে শুরু করেন।

১৯৪৪ সাল। তখন একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন। এর তীব্র সমালোচনা করে কবি ফররুখ আহমদ ১৩৫৪ সনের আশ্বিন সংখ্যায় মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় লেখেন :

"পাকিস্তানের, অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে এ কথা সর্ববাদিসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলাভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করেছেন যা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাদের অভিমত। কি

কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পেছনে কাজ করছে একথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি।"

আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্য ছিল : "উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাংলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবো।"

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বলিষ্ঠ উচ্চারণ ছিল : "পূর্ব পাকিস্তানের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দিকে গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতার নামান্তর হইবে।"

১৯৪৭ সাল। বছরটি ছিল নানা দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর এখন তো সেটা উচ্চকিত এক ইতিহাসেরই অধ্যায়। এই সালে, ১৪ আগস্ট আমরা পেলাম স্বাধীনতার স্বাদ। প্রতিষ্ঠিত হলো পাকিস্তান। মাত্র পনের দিন যেতে না যেতেই দিকে দিকে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো বাংলা ভাষার দাবির জোরালো ধ্বনি। ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর। এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে গঠিত হয় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস। এই প্রতিষ্ঠানই প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলে। তারাই প্রথমত উন্মোচন করে ভাষার দাবিতে সংগ্রামের উত্তপ্ত পথ। সেই সিঁড়ি বেয়েই সংগ্রামের।

সুতীব্র বাতাস বয়ে চলে দেশের ছাত্র-শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীর চেতনায়। কি গতিশীল ছিল সেই ঝাঁঝালো প্রহরগুলো! তমদ্দুন মজলিসের এই দুর্বার আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনে ছিলেন তখন প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, এ.কে.এম. আহসান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম, আজিজ আহমদ, অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, সানাউল্লাহ নূরী, শাহেদ আলী, আবদুল গফুরসহ অনেকেই।

১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। এই দিনে প্রকাশিত হয় বাংলাভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা। নাম– "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?" প্রকাশনায় ছিল তমদ্দুন মজলিস। আর এটা সম্পাদনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম। এতে লিখেছিলেন অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, ইত্তেহাদ সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাসেম। তাদের লেখায় প্রমাণ করা হয় যে, বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবার উপযুক্ত। সুতরাং বাংলাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে বিপুলভাবে জনমত গড়ে তোলার জন্য তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে এক স্বাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত হয়। দেশের বিশিষ্ট মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদসহ বহু ব্যক্তি এতে স্বাক্ষর করেন। মেমোরেন্ডামের একটি কপি সরকারের কাছে পেশ করা হয়। আর তার অন্য কপি পত্র-পত্রিকায় দেয়া হয় প্রকাশের জন্য।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে আরো সোচ্চার ও বলিষ্ঠ করার জন্য প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম

পরিষদ গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর নূরুল হক ভূঁইয়া। তমদ্দুন মজলিসের অফিসে সুরত জামাল মেসের পুরোনো ঘরটিতেই সংগ্রাম পরিষদের কাজ শুরু হয়। প্রথমদিকে কিছুটা গোপনে। পরে অবশ্য প্রত্যক্ষ ও জোরালোভাবেই কাজ চলেছে। তখন তাদের কোনও ভয়ই আর বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি।

আশংকাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো যে, উর্দুই হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা। সবাই উদ্বিগ্ন! এই প্রোপটে ১৯৪৭ সালের ১৭ই নভেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু নয়, বরং বাংলাই হতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের শত শত মুসলিম নাগরিক এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন।

১৯৪৭ সালে মূলত রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। চলতে থাকে নানাবিধ কার্যক্রম। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় প্রথম সংঘর্ষ বাধে ১২ই ডিসেম্বর। স্থান ঢাকার পলাশী ব্যারাক। এই দিনে বাংলা বনাম উর্দু বিতর্কে বাঙালী ও অবাঙালির কেরানীদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষ এক পর্যায়ে তীব্রতর হয়। এতে ২০ জন আহত এবং ২ জন নিহত হয়। এর প্রতিবাদে ১৩ই ডিসেম্বর ছাত্র ও সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা ধর্মঘট করে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার লক্ষ্যে ঢাকা শহরে ১৫ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। ১১ই মার্চ সম্পর্কে ভাষাসৈনিক বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ৪৮ সালের ১১ই মার্চের আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতঅর্থে ১১ই মার্চের আন্দোলন না হলে ৫২-এর আন্দোলন হত না। ৪৮-এর ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে যে সংগ্রাম শুরু হয়, ৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী তা পূর্ণতা পায়।

মোহাম্মদ তোয়াহার দৃষ্টিতে, বস্তুত ৪৮-এর ১১ই মার্চই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত গণবিক্ষোভ। আর কামরুদ্দীন আহমদ বলেছেন, "এ আন্দোলন তৎকালীন সরকারকে রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। অথচ রক্ত দিয়েও ৫২ সালে সরকারকে টলানো যায়নি। ভাষার দাবি উঠাবার নৈতিক বল যতটুকু এসেছিল তা ১১ই মার্চের চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ চুক্তি লংঘিত হয়েছিল বলেই ৫২ সালের আন্দোলন মূলত ২১, ২২, ২৩ এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। এরপর পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার এটাকে তছনছ করে দেয়।"

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। সফরকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনিসিয়াম মাঠে এক ছাত্র সভায় ভাষণ দেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসুর) সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি-সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মেমোরেন্ডাম পাঠ শেষে লিয়াকত আলী খানকে প্রদান করেন। এই ঐতিহাসিক

মেমোরেন্ডাম সম্পর্কে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন : "বস্তুত সে মেমোরেন্ডাম ছিল রাষ্ট্রভাষার দাবিসহ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি-সম্বলিত এক ঐতিহাসিক দলিল।... উক্ত মেমোরেন্ডামে প্রতিরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানের সমঅধিকার, চাকুরির ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রামে নৌ-সদর স্থাপন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দাবিসমূহ সন্নিবেশিত ছিল।"

এই মেমোরেন্ডাম সম্পর্কে ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, ডাকসুর জি.এস. হিসাবে আমি ঐ মেমোরেন্ডাম পাঠ করি। রাষ্ট্রভাষার কথাটি ছিল মাঝামাঝি। এর পূর্বে আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার নিন্দা ছিল। মনে পড়ে, রাষ্ট্রভাষার দাবির প্যারাটি দু'বার পড়েছিলাম। একবার পড়ার পর ছাত্র সমাবেশে তুমুল করতালি পড়ে। করতালি শেষ হলে আমার কানে এলো বেগম রানা লিয়াকত আলী রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্তপ্যারাটি শুনে লিয়াকত আলী খানকে বলেছেন, 'ল্যাঙ্গুয়েজকে বারে মে সাফ সাফ বাতা দেনা।' আমি যেখানে দাঁড়িয়ে স্মারকলিপি পাঠ করছিলাম, তার পাশে রানা লিয়াকত আলী বসেছিলেন। তাঁর কথা শুনে আমি Let me repeat this বলে আবার ভাষার দাবির প্যারাটি পড়লাম। আবারও এ দাবির সমর্থনে সমাবেশে তুমুল করতালি পড়ে।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে লিয়াকত আলী খান বলেন, It is not provincialism, then what is provincialism? তাঁর এ কথাগুলো শুনে আমরা ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু না, তিনি কিছু বলেননি। গোটা প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে যান।"

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী। এদিন পল্টনের এক জনসভায় খাজা নাজীমুদ্দিন পুনরায় ঘোষণা করেন, "উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।" তার এই ঘোষণা ছিল ৪৮ সালের ১৫ই মার্চে গৃহীত রাষ্ট্রভাষা চুক্তির সরাসরি খেলাফ। ফলে তার এই ঘোষণার প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই ৩০ জানুয়ারি বিকালে বার লাইব্রেরী হলে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা ও সংস্কৃতিকর্মীদের এক বৈঠকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৪০ জনের অধিক সদস্য নিয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ। এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হন কাজী গোলাম মাহবুব। এই কর্মপরিষদের উদ্যোগে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ঢাকা শহরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। এই দিন বিকালে কর্মপরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক জনসভা। সভায় মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম ও অন্যান্য রাজনীতিক ও ছাত্রনেতা লীগ সরকারের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নিন্দা করেন। তারা বাংলা ভাষার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আরও ঘোষণা করা হয় যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হবে।

সিদ্ধান্ত মুতাবিক ধর্মঘট সংক্রান্ত সকল প্রস্তুতি এগিয়ে চলছিল। ২০ ফেব্রুয়ারি। এই

রাতে সরকার বেশামাল হয়ে জারি করে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা। বলা হয়, ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে এবং সকল প্রকার ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ থাকবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! সংগ্রামের যে তীব্র আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র, সে আগুনকে সরকার দাবিয়ে রাখবে কেমন করে ? হোক না ১৪৪ ধারা জারি ! ১৪৪ ধারা কেন, পর্বতপ্রমাণ বাধাও তখন তুচ্ছ। সাহসের সাথে সামনে এগুবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কর্মপরিষদের নেতৃবৃন্দ। সিদ্ধান্ত নিলেন, যে কোনও মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। এবং কালই, ২১শে ফেব্রুয়ারী। যে কথা সেই কাজ।

২১শে ফেব্রুয়ারী। ঘন কুয়াশা ঘেরা সকাল। হিম-হিম ঠাণ্ডা। রক্তবরণ ধারণ করেছে কৃষ্ণচূড়ার ডাল। সবার ভেতরে রয়ে গেছে এক আন্দোলনের উত্তাপ। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে দলে দলে ছুটে আসছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা জমায়েত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়। বিপুল সংখ্যক উপস্থিতির এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করলেন জনাব গাজীউল হক। সমাবেশ শুরু হলো বেলা প্রায় সাড়ে বারোটায়। সমাবেশে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের শপথে সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীরা হয়ে ওঠে উজ্জীবিত। চলতে থাকে ক্রমাগত প্রতিবাদী শ্লোগান এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রচেষ্টা।

ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রামের উত্তাল সমুদ্রের গর্জনে কেঁপে ওঠে শাসকের ভিত। দিশা না পেয়ে তারা পুলিশকে নির্দেশ দেয় গুলির। বিক্ষুব্ধ মিছিলের ওপর চললো নির্বিচারে পুলিশের লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি। মুহূর্তেই রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠলো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। মাটিতে ঢলে পড়লেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সালাউদ্দিনসহ অনেকেই। তাদের অমোচনীয় রক্তে লেখা হলো ২১শে ফেব্রুয়ারী। আর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে নতুন করে জেগে উঠলো সারা দেশ। সে ছিল রক্তের বিনিময়ে অধিকার আদায়ের এক তীব্রতম সংগ্রাম। সে ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম, সে ছিল মূলত বাংলা ভাষার লড়াই।

শহীদের তাজা খুনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের বাংলা ভাষার মর্যাদা। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং একই সাথে রাষ্ট্রভাষা। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এই ভাষার মর্যাদাপূর্ণ পতাকা আজ সগৌরবে পতপত করে উড়ছে বিশ্বের দরবারেও।

যাদের সীমাহীন ত্যাগ, সংগ্রাম আর আন্দোলনের মাধ্যমে প্রিয় বাংলা আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁরা সবাই ইতিহাসের নন্দিত পথিকৃৎ। কালের অক্ষরে অমর। তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাও তাই অশেষ। এখন আমাদের উচিত, প্রাণের ভাষা বাংলার সামগ্রিক মর্যাদা রক্ষার জন্য অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

বাংলা রাষ্ট্রভাষার অর্থ কিন্তু অপরাপর ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা জানানো নয়। ইংরেজি, আরবীসহ সকল ভাষাই আমাদের শিখতে হবে, এসব ভাষায় আমাদের দক্ষ হতে হবে, কিন্তু বাংলার প্রতি সার্বিক শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ থাকতে হবে পৃথকভাবে। বাংলার আসনটি থাকবে আমাদের হৃদয়ে অন্যভাবে, সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এক ক্যানভাসে।

১৯৫২ থেকে আজ পর্যন্ত। এর মধ্যে বয়ে চলেছে দীর্ঘ বছর। একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের কাছে বিশেষ এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ঐতিহাসিক দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই আমাদের সেই গৌরবান্বিত ইতিহাসের কথা। সেই সাথে যেন ভুলে না যাই বাংলা ভাষা আন্দোলনে মুসলিম অবদানের গৌরবজনক অনিবার্য সেই অবিস্মরণীয় ইতিহাসের কথাও।

বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে আমাদের করণীয়

ভাষার জন্যে সংগ্রাম করা আর জীবন দেবার ঘটনা এই পৃথিবীতে একটি বিরল ইতিহাস। এই ইতিহাসের স্রষ্টা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাদী লড়াকু, সংগ্রামী মানুষ। তারা বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং অকাতরে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষাকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে।

কেন এই সংগ্রাম?

প্রশ্নটি মৌলিক। এ প্রশ্নের জবাবের জন্য আমাদেরকে বারবার একটু পেছনে তাকাতে হবে।

পলাশীর বিপর্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান লেখকদের হাতেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হয়েছে। তারা বাংলা ভাষাকে একটি পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করলাম। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের ভাষার স্বাধীনতা ছিলো না। পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের মাতৃভাষার প্রতি এতোটুকু সম্মান দেখায়নি। তাদের হাতেও লাঞ্ছিত হয়েছে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার এই অবমাননা দেখে এ দেশের লড়াকু মানুষের হৃদয়ের এতোকালের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ফেটে পড়লো। বাংলা ভাষাকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এদেশের মানুষ জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভাষার জন্য এই সংগ্রাম ছিল অনিবার্য।

কিন্তু কি পেলাম? একটি রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ভাষাকে আমরা স্বাগত জানিয়ে আপন বুকে স্থান দিতে চেয়েছিলাম, সেই বাংলা ভাষা এই দেশেই তৃতীয় ভাষা হিসাবে উঠোনে স্থান পেল।

কাগজে-কলমে বাংলা ভাষা এখন 'রাষ্ট্রভাষা' মর্যাদা পেলেও মূলত এটা আমাদের জন্য একটি মারাত্মক প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতারণা বলছি এই কারণে যে, একদিকে আমাদের অফিস-আদালতে প্রচলিত রয়েছে ইংরেজী ভাষা। আর অন্যদিকে আমাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্রাটের মতো বসে আছে 'সংস্কৃতনির্ভর বাংলা।' এই সংস্কৃত ভাষার দাপট এমনি যে, তার মধ্য থেকে আমাদের বাংলা ভাষাকে সনাক্ত করাই দুরূহ কাজ হয়ে পড়েছে। আমাদের শিশুদেরকে এখনো বর্ণজ্ঞান দিতে হয় বাংলা অক্ষরের সামনে-পেছনের সংস্কৃত শব্দ এবং বাক্যের মাধ্যমে।

একটি স্বাধীন দেশের 'রাষ্ট্রভাষা'– যখন বাংলা, তখন সেই বাংলা ভাষারই এই করুণ অবস্থা দেখে বুকের ভেতর হু-হু করে কেঁদে ওঠাই স্বাভাবিক।

অনেকেই বলেন, বাংলা ভাষা তার আপন মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। যারা এমন কথা বলেন, তারা কিছুমাত্র চিন্তা ভাবনা করে যে বলেন না, তা বলাই বাহুল্য। বাংলা ভাষা ব্রাহ্মণ্য ভাষার নাগপাশ ছিন্ন করে কতোটুকু এগিয়েছে? এই মৌলিক প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যাবার কোনো অবকাশ নেই।

ভাষাগত কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেই যে একই জাতি সত্তা নিয়ে দু'টি জাতি একই সাথে অগ্রসর হতে পারে না, একই আদর্শ ও ঐতিহ্যের হয় না– তা পশ্চিম বাংলা ও আমাদের জীবনাচরণ দিয়ে কি প্রমাণিত হয় না? তাদের ভাষায়, তাদের সাহিত্যে আমাদের জীবনের, আমাদের বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের কি কোনো সাক্ষর পাওয়া যায়? যদি না যায় তাহলে আমাদের লেখকদের কেন এই অন্ধ গোলামী করার বাসনা? কোন্ স্বার্থে? স্বাধীনতার এতো বছর পরও আজ আমাদেরকে এই লজ্জাজনক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি থাকতে পারে!

বাংলা ভাষা ঘরে এবং বাইরে এখনো সমান আক্রান্ত। ভারত বাংলা ভাষার অবিরত শেকড় কাটছে, আর আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লেখক-বুদ্ধিজীবীরা তাতে খুশি হয়ে তারাও বাংলা ভাষার কাণ্ড, বাকল লতাপাতা কেটে একেবারে উলঙ্গ করে দিচ্ছে। ভারত এই জঘন্য কাজ করছে সম্পূর্ণ জেনে বুঝে, সুপরিকল্পিতভাবে, আমাদেরকে আপন মর্যাদার, আপন বিশ্বাস ও ঐতিহ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না দেবার জন্য। আর বাংলাদেশের তথাকথিত লেখক-বুদ্ধিজীবীরা এই অপকর্মটি করছে কিছুটা ভারতকে খুশি করার জন্য জেনে বুঝে, আর কিছুটা না বুঝেই। না বুঝার কারণ হলো, এরা কখনো তো শেকড়ের সন্ধান করেনি। নিজেরাও অস্তিত্বহীন, ভাসমান। এদের পা যে এদেশের কাদামাটিতে, এদেশের ধুলোয়, এদেশের সবুজের ওপর নেই– একথা পুনর্বার ব্যক্ত করার আর কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করি– বাংলা ভাষা এখনো শত্রুমুক্ত নয়। এখনো নিরাপদ নয়। তবু তো আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। সকল অবাঞ্ছিত শত্রুতার মুকাবেলায় বাংলা ভাষাকে তার আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এদেশের ঐতিহ্যপ্রিয় জাগ্রত বিবেকদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা এবং সুসংহত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগুতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস, আঁধার যতো গাঢ়ই হোক, যতো দীর্ঘই হোক– তা অপসারিত হবেই, হবে। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন :

১. ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকতে হবে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে বাংলা ভাষায় যে অমূল্য রত্নভাণ্ডার আছে– তা নগণ্য নয়, সমৃদ্ধ। এই ভাষার ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। তৃতীয় ভাষা নয়, বাংলাই হতে হবে আমাদের জন্য প্রথম ভাষা। আমাদেরকে বুঝতে হবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে ভাষার স্বাধীনতা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেবার অর্থ কিন্তু বিশ্বের অপরাপর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোকে একেবারে

বাদ দেয়া নয়। কুরআনিক ভাষা– আরবী ছাড়াও আমাদের ইংরেজী, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই দক্ষতা অর্জন করতে হবে মূলত জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও বিশ্ব সাহিত্যের সাথে আমাদের সাহিত্যের বিনিময়ের জন্য। বর্জন নয়, বরং অর্জনের মধ্য দিয়েই আমরা কাঙ্ক্ষিত সফলতার চূড়া স্পর্শ করতে চাই।

২. গোলামী পরিহার করা

আমরা যে দাসত্বের শিকার হয়ে সংস্কৃত এবং ইংরেজীর গোলামী করছি, আমাদের মন থেকে এই গোলামী করার মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের আত্মপ্রত্যয়ী এবং ঐতিহ্যবাদী হতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য ছাড়া একটি ভাষা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে হবে।

দেশ হিসাবে আমরা যেমন একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক, ঠিক তেমনি আমরা একটি পৃথক বিশ্বাস ও ঐতিহ্যেরও ধারক বটে। এদিক দিয়েও আমরা স্বতন্ত্র। আমাদের ভাষায় সেই বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ছোঁয়া থাকতে হবে। আমাদের জীবনবোধ, জীবনাচরণের এবং আমাদের সকল কর্মপ্রবাহে তার প্রতিফলন থাকতে হবে। বাংলা ভাষার প্রতিটি কোষে কোষে।

৩. আহরণ ও শব্দ সম্ভার বৃদ্ধি

বাংলা ভাষার একটি বিশাল অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের হাজারো গ্রামের কাদা মাটিতে। উদারতার সাথে এবং সচেতনতার সাথে আমাদেরকে সে সকল অবহেলিত শব্দ ভাণ্ডারকে ডুবুরীর মতো খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এবং তা কাজে লাগাতে হবে।

৪. বিশুদ্ধ বাংলা অভিধান এবং ব্যাকরণ প্রণয়ন

সংস্কৃত, তৎসম বা আধা তৎসম শব্দকে উপড়ে ফেলে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার শব্দ দিয়ে 'বাংলা অভিধান' তৈরি করতে হবে। ঠিক তেমনি, বাংলা ব্যাকরণকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। বাংলা বানানের সকল জটিলতা পরিত্যাগ করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য 'বানান রীতি' তৈরি করতে হবে। ঢেলে সাজাতে হবে আমাদের পাঠ্যপুস্তককে। হিন্দু ব্রাহ্মণদের ভাষা যে আমাদের ভাষা নয় এবং আমাদের ভাষা যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যময়ে ভাস্বর– পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীদের জন্য বুঝাতে হবে। এজন্য প্রয়োজন শিশুদের বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্য বই লেখা ও প্রকাশ করার।

৫. ভাষা ও সাহিত্যের বিনিময়

বাংলা ভাষা একটি উদার ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। এই ভাষা অকৃপণভাবে ধারণ করেছে ইংরেজী, আরবী, ফারসী, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ভাষার শব্দরাজি।

বাংলা ভাষায় অনূদিত হচ্ছে পৃথিবীর অনেক ভাষার সাহিত্যকর্ম। বিদেশী ভাষা শেখার জন্য আমাদের রয়েছে অদম্য স্পৃহা। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, বাংলা ভাষা যেমন অন্য ভাষা গ্রহণ করেছে, অন্য ভাষা বাংলাকে ঠিক তেমনভাবে গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতাই দায়ী। পৃথিবীর ক'টি দেশ বাংলা ভাষার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানে?

'বিনিয়মটা' যদি গ্রহণের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাকে 'বিনিময়' বলা যায় কিভাবে? এখন আমাদের উচিত, আমাদের ভাষা এবং এই ভাষায় রচিত বইপত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া। এটা কোনো একক গোষ্ঠী বা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নিলে অবশ্য সম্ভবপর হতে পারে এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।

৬. প্রকাশনা ও পত্র-পত্রিকা

বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে, প্রকাশনার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে উদারতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলা ভাষায় যতো বেশি বই প্রকাশিত হবে ততোই এই ভাষার শেকড় সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী হবে।

সাহিত্য পত্রিকার প্রসঙ্গও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে এখন সাহিত্য পত্রিকা প্রায় অবলুপ্ত। লেখক তৈরি করার একটি বিরাট মাধ্যম হলো সাহিত্য পত্রিকা। যদি সেই সাহিত্য পত্রিকাই না থাকে, তাহলে নতুন মেধাবী লেখক আমরা কোথায় পাবো? এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে এই জাতির দুর্ভোগের আর সীমা থাকবে না। সুতরাং এ বিষয়ে এখনই আমাদের সচেতন হতে হবে।

৭. লেখকদেরকে যথাযথ সম্মাননা প্রদান

একটি ভাষার প্রধান বাহক হলেন সেই ভাষার লেখক। কেবল লেখকের মাধ্যমেই ভাষাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখককেই প্রায় 'চতুর্থ শ্রেণীর' নাগরিক বলে মনে করা হয়।

আমাদের লেখকরা বই লেখেন আর প্রকাশকরা সেই বই বিক্রি করে ব্যবসা করেন। পত্র-পত্রিকার সাহিত্য পাতায় লেখকরা লেখেন আর অধিকাংশ অপরিণামদর্শী মালিক-কর্তৃপক্ষরা সেই পত্রিকা দিয়ে মুনাফা লোটেন। কিন্তু বরাবরই লেখকের ভাগ্য থেকে যায় প্রায় শূন্যের কোঠায়। ব্যতিক্রম তো দু'একটা থাকতেই পারে। সে কথা স্বতন্ত্র।

মুনাফাখোর এসব প্রকাশক এবং নামসর্বস্ব পত্রিকার মালিকদের বাণিজ্যিক মনোভাব পরিত্যাগ করে একটু মানবিক হতে হবে। জাতির জন্য, ভাষার জন্য, সাহিত্যের জন্য কিছুটা বিবেকবান হতে হবে। লেখকদের প্রতি সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাতে হবে এবং তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়ে দিতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, লেখকদের যা দেয়া হচ্ছে– সেটা দান নয়, উদারতা নয়, অনুকম্পা নয়– সেটা তাঁদের পারিশ্রমিক। এখানে কোনো কৃপণতা কিংবা গড়িমসি কাম্য নয়। যদি লেখকরা তাঁদের যথাযথ প্রাপ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন, তাহলে তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বোৎকৃষ্ট লেখার কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে পারবেন। আর তাতে করে লাভবান হবে আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের জাতি।

৮. ভাষার নিয়ন্ত্রণ

লেখকের সম্মাননা তাঁদের প্রাপ্য। সেটা তাদের দিতে হবে। কিন্তু আবার লেখকদেরকেও সচেতন হতে হবে। ভূঁইফোঁড় হাতুড়ে লেখকদের (?) হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে।

লেখক হবার বাসনায় অনেকে এখন বাংলা ভাষার ওপর যে রকম অত্যাচার শুরু করেছেন তাতে করে আমরা শংকিত না হয়ে পারি না। সাহিত্যকে তাঁরা মাছ তরকারির মতো বাণিজ্যিক পণ্য করে তুলেছেন। এসব আগাছা-পরগাছা দূর করতে না পারলে বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য যে আবর্জনার স্তূপে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে– তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক সকলেরই এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, একটি ভাষাকে রক্ষার জন্য আমরা শুধু কাজ করছি না, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি। কাজটি অনেক বড়। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকা জরুরী।

আমাদের মনে রাখা জরুরি যে, বিশ্বের অপরাপর প্রধান ভাষাগুলো থেকে বাংলা ভাষা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। সুতরাং বাংলা ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারলে এই ভাষার উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিপুল। যদিও আইন করে এই অত্যাচার থেকে কাউকে বিরত রাখা যাবে না, তবুও আমাদের প্রত্যেকের সতর্ক দৃষ্টিই আইনের চেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

৯. পৃষ্ঠপোষকতা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব নিয়ে সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে তাদেরকে এ কাজ করতে হবে। যোগ্য লেখকদেরকে যথাযথ পারিশ্রমিক দিয়ে লেখাতে হবে এবং প্রকাশনা বৃদ্ধি করতে হবে। সেইসাথে প্রকৃত ঐতিহ্যবাদী যোগ্য লেখককে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করতে হবে। কাজের স্বীকৃতি পেলে সবাই উদ্বুদ্ধ হবেন। পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনো ভালো ফল পাবার আশা করা যায় না। একটা দু'টো নয়, আমাদের বহু প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষার চর্চা, গবেষণা এবং লেখকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

১০. গ্রহণ এবং বর্জন

উদার ভাষা বাংলা ভাষা। পৃথিবীর বহু ভাষাই এই বাংলার মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বিদেশী শব্দ হলেই যে সেটা বাদ দিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে যে সকল বিদেশী শব্দ আমাদের প্রতিদিনকার উচ্চারিত শব্দের ভেতর মিশে গেছে এবং যা আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়– সে সকল শব্দ বাদ দেবার বা তার কষ্টসাধ্য উচ্চারণের মাধ্যমে অঙ্গহানি করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন চেয়ার, কলম, নামায, রোযা, আযান প্রভৃতি। আবার যে সকল শব্দ আমাদের কেবল অভিধান আর ব্যাকরণেই সীমাবদ্ধ, কিংবা জোর করে আমাদের ভাষার মধ্যে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যা আমাদের প্রতিদিনকার উচ্চারণে কোনো প্রয়োজনই নেই এবং যা সরাসরি আমাদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক, আমরা এসকল শব্দকে বর্জন করতে পারি। হতে পারে তা ইংরেজী কোনো শব্দ, হতে পারে সংস্কৃত বা অন্য কিছুও।

১১. বিপুল সম্ভাবনার একটি দুয়ার

আমাদের কাছে 'পুঁথি সাহিত্য' ক্রমাগত অস্পৃশ্য হতে চলেছে। এটা ঠিক নয়। আমি বলছি না যে, পুঁথি সাহিত্য আমাদের আবার রচনা করতে হবে। বরং বলতে চাইছি, পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে যে বিপুল শব্দ ভাণ্ডার রক্ষিত আছে তা আবিষ্কার করতে আর একটি বিপুল-বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যেতে পারে। আমরা পেতে পারি অজস্র নতুন নতুন শব্দ। যা হতে পারে একেকটি হিরকখণ্ডের মতোই মূল্যবান। অবহেলা আর অনাদরে এতোকাল পড়ে আছে আমাদের এই ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাণ্ডারটি। অথচ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতও একদা বলেছিলেন :

"যদি পলাশীতে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়ত এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।"

দুর্ভাগ্য আমাদের! পলাশীর প্রান্তরে মুসলমানদের কেবল ক্ষমতারই সমাপ্তি ঘটেনি– এই পলাশীতেই মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যেরও পরাজয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল।

ইংরেজ কিংবা উগ্রহিন্দু ব্রাহ্মণ– তারা বাংলা ভাষাকে কখনোই সম্মানের চোখে দেখেনি। তারা বরাবরই ইংরেজী, সংস্কৃত এবং হিন্দিকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। এখনো তাই দিচ্ছে।

বাংলা ভাষাকে বরাবর সম্মানের চোখে দেখেছে এবং এই ভাষাকে প্রথম থেকে লালন করেছে একমাত্র মুসলমানরাই। মুসলমানদের হাতেই বাংলা ভাষা পেয়েছে তার আবেগঘন প্রাণ।

পথিমধ্যে এসেছে ঝড় আর প্রতিবন্ধকতার ভয়ংকর তুফান। সাময়িকভাবে হয়তো বা দুমড়ে মুচড়ে গেছে কিছুটা প্রহর। কিন্তু তারপর।– তারপর এই ঐতিহ্যবাদী মুসলমানরাই আবার ঠিকই বাংলা ভাষার হাল ধরে এগিয়ে গেছেন।

আমাদের দেশেই এখনো ভাষা শত্রুমুক্ত নয়। উগ্রশ্রেণীর হিন্দু এবং তথাকথিত প্রগতিবাদীদের হাতে বাংলা ভাষা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে। বাংলা ভাষাকে এখনো তারা হিন্দু ব্রাহ্মণ, কিংবা কায়েত বামুনদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে মনে করে। তাদের এই হীনমন্যতায় বাংলাদেশে ভাষা সংক্রান্ত একটি অলিখিত বিভেদের দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে।

বিশ্বাস, আদর্শ আর ঐতিহ্য ছাড়া কোনো ভাষাই আপন পায়ে দাঁড়াতে পারে না। যেহেতু এদেশের তথাকথিত উগ্র প্রগতিবাদীদের আদর্শ আর ঐতিহ্যের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, এদেশের সিংহভাগ মানুষের জীবনাচরণের সাথে তাদের কোনো একাত্মতা বা শ্রদ্ধাবোধ নেই এবং এদেশের জাতীয় সত্তার সাথে তাদের কোনো প্রেম ও ভালোবাসা নেই, কোনো দায়বদ্ধতাও নেই– সুতরাং আমরা আশাবাদী যে, অচিরেই বিভেদের দ্বন্দ্ব অপসারিত হয়ে ঐতিহ্যবাদীদের হাতেই এদেশের ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করবে। বাংলা ভাষার শত্রুরা পরাস্ত হবে এবং অবিসংবাদিত বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দাঁড় করানোর জন্য শেকড় সন্ধানী ঐতিহ্যবাদীরাই বরাবরের মতো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে।

সেই উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এই ঐতিহ্যবাদীরাই সশ্রদ্ধচিত্তে সমৃদ্ধি দানে প্রভূত ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষত বাংলা ভাষাকে যেমন কালজয়ী কবি নজরুল ইসলাম বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছেন, যেমন কবি গোলাম মোস্তফা, কবি ফররুখ আহমদ এই বাংলা ভাষাকে একটি নতুন প্রাণ দান করেছেন, ঠিক তেমনি আমরা লক্ষ্য করছি– আশির দশকের ঐতিহ্যবাদী লেখকদেরকে। তারাও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এই ভাষাকে আরও বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে দেবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁদের সাহিত্যে আন্তর্জাতিক মনস্কতাও চোখে পড়বার মতো বিষয় বটে। আশির দশকের এই সচেতন– শ্রমলব্ধ প্রয়াস বিফলে যাবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান-এর প্রেক্ষাপটে এখানে ঐতিহাসিক 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' বিষয়টিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কারণ এই ইতিহাসের মধ্যে রয়ে গেছে আমাদের স্বাতন্ত্রিক চিন্তা ও ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করার এক মৌলিক মনোভঙ্গি।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলেন নবাব সিরাজুদ্দৌলা। আর সেই সাথে অস্তমিত হলো শুধু স্বাধীনতার সূর্যই নয়, বরং মুসলমানদের হাজার বছরের অর্জন– গর্বিত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সার্বিক মূলবোধ ও মুখ থুবড়ে পড়লো! এতে অপরিণামদর্শী বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর যতোটা না পুলকিত হলো, তার চেয়ে শতগুণ বেশী আনন্দিত হলো বিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠ, রায় দুর্লভেরা।

জগৎশেঠ, রায় দুর্লভদের উল্লসিত হবার কারণ ছিল বহুবিধ। মীর জাফরের মত কেবল ক্ষমতা হস্তগত করার স্থূল বাসনায় তারা তাড়িত এবং প্রভাবিত হয়নি। বরং মুসলিম শাসনের পতনের মাধ্যমে তারা সুদীর্ঘ লালিত ও কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তিই লাভ করলো! ক্ষমতার মোহে লোলুপ কতিপয় আত্মঘাতি মুসলিম ব্যক্তি জাতির জন্য বিষয়টির সুদূরপ্রসারী কুফল ও দুর্ভোগ বুঝে উঠতে সক্ষম না হলেও, হিন্দু জাতিগোষ্ঠী কিন্তু সেদিন ঠিকই বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিহাসই তার সাক্ষী। মুসলিম শাসন অবসানের পর থেকে একচেটিয়াভাবে তারাই ফায়দা হাসিল করেছে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে। আর দিন যত গেছে, ততোই মুসলমানরা হয়ে পড়েছিল নিজ দেশে পরবাসী। এমনকি অপাংক্তেয় ও অচ্ছ্যুত! মুসলমানদের ললাটে সেই কালিমা আষ্টেপৃষ্ঠে লেপে ছিল পরবর্তী কয়েকটি শতক। আর ততোদিনে স্বার্থ উদ্ধারে, বিত্তবৈভব অর্জনে, শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে হিন্দুরা বানের পানির মত ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় উগ্র হিন্দু জাতিগোষ্ঠীর এই স্বার্থচিন্তা ও বৈষয়িক ভেদবুদ্ধিই প্রধানত কাজ করেছিল। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল মুসলিম বিদ্বেষ। মুসলমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক, সামাজিক কিংবা বৈষয়কি উন্নতি ছিল

হিন্দুদের জন্য সহ্যের অতীত। সেই গাত্রদাহ থেকে তারা বঙ্গভঙ্গের চরম বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। সেই বিরোধিতায় হিন্দু কবি-লেখক, বুদ্ধিজীবী, জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী, বণিক, মৃৎসুদ্দী শ্রেণীর হিন্দুরা। এই তালিকা থেকে তাদের মতলবটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৈকি! দেশপ্রেম, মানবতাপ্রেম– না, কোনোটাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে। হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা ছিল এক সংকীর্ণ বিদ্বেষপূর্ণ অশুভ তৎপরতা– যা ছিল দেশ ও মানবতার প্রতিকূলে।

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হলো কলকাতা টাউন হলে এক জনসভা। বিষয়– বঙ্গভঙ্গ ঠেকানোর জন্য জনমত তৈরি ও কৌশল উদ্ভাবন। এখানেই বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' রণহুংকারে গর্জে উঠলো! কিন্তু বিস্ময়কেও হার মানিয়ে ১৯০৫ সালের ২৪ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর দু'টি জনসভায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বঙ্গভঙ্গের' প্রতিবাদস্বরূপ 'বঙ্গবিভাগ' বাস্তবায়নের দিন ১৬ই অক্টোবর 'রাখিবন্ধন' দিবস ঘোষণা দেন তার সভাপতির ভাষণে!

রবীন্দ্রনাথ এখানেই থেমে গেলেও পারতেন। কিন্তু তিনি থামেননি। বরং জমিদারের আভিজাত্যে তিনি সেদিন 'কবির' চেয়েও 'স্বার্থান্বেষী' জমিদার হিসাবে আগ্রাসী হয়ে উঠেছিলেন অনেক বেশী। এজন্য তিনিও হিন্দু জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার সাথে সকলপ্রকার বিবেক-বিবেচনাহীনে একাত্ম হয়ে গেলেন। তাঁর কণ্ঠ হয়ে উঠলো অন্যদের চেয়েও তীর্যক। হতবাকই হবার কথা, তাঁর ঘোষিত ১৬ই অক্টোবর 'রাখিবন্ধন'-এর দিন সকালে 'গঙ্গাস্নানের' মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই 'গঙ্গাস্নানের' অনুষ্ঠানে তিনি একটি স্বরচিত প্রার্থনা সঙ্গীতও গাইলেন। সেই প্রার্থনা সঙ্গীতটি ছিল এরকম :

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক।
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক পুণ্য হউক।
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর পণ বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান ॥"

প্রার্থনা সঙ্গীত শেষে বীডন উদ্যানে ও অন্যান্য স্থানে 'রাখিবন্ধন' অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে রবীন্দ্রনাথ পার্শী বাগান মাঠে অখণ্ড বাংলার 'বঙ্গভবন' স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে 'ফেডারেশন হলের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এখানে তিনি তাঁর অভিভাষণে পাঠ করলেন : "যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সার্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব।"

সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্ররা 'যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ' করেছিলেন। উগ্র ও জঙ্গীবাদী হিন্দুদের ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর কারণে ও চাপে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হয়ে গেল।

'বঙ্গভঙ্গ' রদের পর, ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। এটা ছিল মূলত মুসলমানদের কাটা ঘায়ে মলম লাগানোর মত একধরনের সান্ত্বনামূলক সিদ্ধান্ত। তবুও ভালো। কিন্তু এখানেও বিরোধিতা ও প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন রবীন্দ্রনাথ। যিনি বিশ্ব কবি, মানবতার কবি বলে তৃপ্তি বোধ করেন, তিনি মুসলমানদের এই এতটুকু সফলতার আশ্বাসেও ফুঁসে উঠলেন। অনুষ্ঠিত হলো ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক হিন্দু-জনসভা। কৌতূহলের বিষয় বটে, এই প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করলেন 'মানবতার কবি' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ! এভাবেই ব্যক্তি স্বার্থ ও সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের বেড়াজাল টপকে রবীন্দ্রনাথও প্রকৃত 'কবিমানসের' পরিচয় দিতে পারেননি! যেমন পারেননি বঙ্কিমচন্দ্রও। ক্ষুদ্র হিন্দুবাদের মধ্যে তারা সবাই একাকার হয়ে গেলেন। আর ম্লান হয়ে গেল তাঁদের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের সাক্ষর!

অথচ, সেই রবীন্দ্রনাথই এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র 'অসাম্প্রদায়িক কবি-ব্যক্তিত্ব' হিসাবে 'পূজনীয়'! এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রসহ কোনো হিন্দুই কখনো চাননি– মুসলমানরা শিক্ষায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, বিত্তবৈভবে, সমাজ ও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হোক। মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার জন্য যতপ্রকার অপকৌশল থাকতে পারে– তাঁরা সবই প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু কাল বড় নির্মম। তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না কোনো জাতি-গোষ্ঠী। যেমন তাঁরাও পারেননি।

'বঙ্গভঙ্গ' রদ হয়েছে সত্য। কিন্তু এটুকুই তাদের জন্য সকল সান্ত্বনার বিষয় নয়। কারণ এর আগের ও পরের ইতিহাস সম্পূর্ণ তাঁদের প্রতিকূলে। তারা এদেশে বখতিয়ার খিলজির ঘোড়াকে অবরুদ্ধ করতে পারেননি। ঈসা খাঁর তরবারিকে ভাঙ্গতে পারেননি। তাঁরা রুখতে পারেননি খান জাহান আলী, শাহজালাল, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রমুখ সৈনিকদের। 'বাঁশের কেল্লা' ভাঙ্গলেও তিতুমীরকে ভাঙ্গা বা নিশ্চিহ্ন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর সম্ভব হয়নি বলেই ১৯৪৭ সালের 'খণ্ডিত ভারত' তাঁদের দেখতে

হলো। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৯৫২ সালে তাঁরা দেখলেন বুকের রক্তের বিনিময়ে কিভাবে মাতৃভাষাকে উচ্চকিত করে স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা নির্মাণ করতে হয় এবং ১৯৭১ সালে তাঁরা আর একবার প্রত্যক্ষ করলো, লাখো প্রাণের বিনিময়ে একটি ক্ষুদ্র জাতি কিভাবে তাদের দেশ ও মানচিত্রকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে পারে।

তাঁদের এখন সম্বিত ফিরে আসা উচিত যে, পদানত হবার জন্য মুসলিম জাতির উদ্ভব ঘটেনি, বরং মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্যই এ জাতির সৃষ্টি। কোনো প্রতিবন্ধকতা ও কূটচালই শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি, আগামীতেও পারবে না। কারণ, 'বঙ্গভঙ্গ' রদের বেদনার ক্ষত এ জাতি পুষিয়ে নিতে জানে। জানে সাহস, সংগ্রাম ও আগুনের পর্বত টপকে কিভাবে নিজেদের বিশ্বাস, আদর্শ, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতির ভিতকে আরও মজবুত ও সুদৃঢ় করতে হয়।

আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং ঐতিহ্যিক ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন যে একটি টার্নিং পয়েন্ট একথা বলাই বাহুল্য।

শতাব্দীর মুসলিম বাংলা সাহিত্য

বিশ শতকের সাহিত্যের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা অনেকটা আশান্বিত হয়ে উঠি। কারণ, আমাদের দেশে রাজনৈতিক কিংবা মতাদর্শিক বিভেদ যতই ঘটুক না কেন, অন্তত একটা জায়গায় আমরা সফলতা অর্জন করেছি। আর সেটা হলো, বাংলা সাহিত্যের রাজধানী হিসাবে ঢাকাকে প্রতিষ্ঠিত করা গেছে। আমাদের এই যে সফলতা– এই সফলতা কোনো একক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় যেমন অর্জিত হয়নি, তেমনি হয়নি কোনো একক দল বা সংগঠনের প্রচেষ্টাতেও। এই বিজয় যেমন আমাদের বাংলা সাহিত্যের বিজয়, তেমনি এই বিজয়ের নায়ক– আমাদের দেশের সকল ঐতিহ্যবাদী লেখক, কবি-সাহিত্যিক। সম্মিলিত একটি আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই আমাদের সাহিত্য আজ পশ্চিম বাংলার কবল থেকে ছিন্ন হয়ে আপন মহিমায় ভাস্বর হতে পেরেছে। সুতরাং এই বিজয়ের আনন্দ আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাদী সকল শ্রেণীর লেখকের সমান প্রাপ্য।

বিশ শতকের সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা হয়তো বা তাৎক্ষণিক উচ্চারণযোগ্য তেমন কোনো চূড়ান্ত সফলতার কথা বলতে সক্ষম হবো না। কিন্তু সেই ব্যর্থতার ছাদ ফুঁড়েও কি কোনো প্রত্যাশিত আলোক রশ্মি আমাদের সাহিত্যের ঘরে প্রবেশ করেনি?

নিশ্চয়ই করেছে। তা-না হলে ইউরোপীয় কিংবা পশ্চিম বাংলার প্রতাপশালী প্রভাব থেকে আমাদের সাহিত্য মুক্তি পেল কিভাবে?

এক্ষেত্রে সাহিত্যের যে অবদান– তা কোনো একটি দশকের লেখকের একক কোনো অবদান নয়। বরং এই অবদান– বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের প্রথম থেকেই, বিশেষত এই শতকের বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি এমনকি আজকের একেবারে নবীনতম ঐতিহ্যবাদী মুসলিম লেখকেরও এবং আশার কথা, এখনো এই ধারা অব্যাহত আছে।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বাংলাদেশটা কবিতার জন্য যতটা প্রস্তুত, সম্ভবত সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের জন্য ততোটা নয়। একটি শতাব্দীর সাহিত্য নিয়ে যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এই সত্যটিই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের কবিতাই কেবল অপ্রতিরোধ্য, অকৃত্রিম এবং জীবন্ত এক মাধ্যম। বিশাল এবং বিচিত্র ধারায় আমাদের কবিতা বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদীর মতো এবং সেটা চির বহমান।

'৪৭-এ স্বাধীনতা অর্জন, '৫২-এ ভাষা আন্দোলন, '৭১-এ স্বাধীনতা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা, আমাদের কবিতাকে কখনো কখনো মহিমান্বিত করেছে, আবার কখনো বা কবিতায় নিয়ে এসেছে ব্যর্থতা। কিন্তু সব মিলিয়ে আজ দেখা যাচ্ছে, কবিতাই আমাদের সাহিত্যের অগ্রগামী এবং বেগবান একটি মাধ্যম হিসাবে এদেশের সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে।

কবিতা যেভাবে এগিয়েছে, সাহিত্যের অন্য কোনো মাধ্যম তেমনটি পারেনি। ছোটগল্পের দিকে তাকালে আমাদের ব্যর্থতার ক্ষতটা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যদিও কবিতার মতই ছোটগল্পের জন্যও আমাদের দেশটি উর্বর ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেইভাবে ফসল ফলেনি। আমাদের দেশে যদিও শক্তিমান গল্পকার ছিলেন, এখনো আছেন– তবুও আমরা ঢাকতে পারিনি আমাদের ব্যর্থতার গ্লানি। যারা আছেন– তারাও এক ধরনের হতাশায় মুহ্যমান। এর কারণ সম্ভবত ছোটগল্পের প্রকাশনা সংকট। যদিও এটিকে একমাত্র কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না, তবুও বলবো– অনেকটাই তো বটে। সস্তা উপন্যাসের চাপে ছোটগল্পের ত্রাহি অবস্থা। বলতে গেলে বাজার এখন সেই সস্তা উপন্যাসেরই দখলে।

আফসোসের বিষয়, আমাদের সাহিত্যের সবচেয়ে ক্ষীণতম দিকটি হয়ে গেছে গল্পের। সস্তা উপন্যাসের রমরমা উত্থান। এখন তো বাজার সয়লাব। প্রকাশকদের দৃষ্টিও অর্থ এবং বাজারের দিকে। ফলে ছোটগল্প যারা লিখতে পারতেন– ক্রমাগত অবহেলা, বঞ্চনা, আর ঘটনার আকস্মিকতায় তারা অনেকটা থেমে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আজ একথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিশ শতকের শেষ প্রান্তে আমাদের কবিতায় যতোটা সফলতা এসেছে, ততোটাই ব্যর্থতা এসেছে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। প্রকৃত অর্থেই ছোটগল্পের জন্য এখন বড় দু:সময়।

কিন্তু তার চেয়েও কি বড় কোনো ব্যর্থতা আমাদের সাহিত্যে নেই? আছে বৈকি! সেই ব্যর্থতা হলো– আমাদের সমালোচনা সাহিত্য এবং মননশীল প্রবন্ধের ক্ষেত্র। হাতে-গোনা মাত্র দু'একজন ছাড়া, সত্য বলতে এদিকে তেমন কেউ অগ্রসর হচ্ছেন না।

শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রটি অবশ্য কবিতার মতোই অনেকটা উজ্জ্বল। আমাদের শিশু সাহিত্যের জমিনটি ফুলে-ফসলে ভরে উঠেছে। আমার তো মনে হয় এই মাধ্যমটিও আমাদের দেশের এখন প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এককালে পশ্চিম বাংলার শিশু সাহিত্যের দিকে আমরা যেভাবে তৃষিত চোখে তাকিয়ে থাকতাম, আজ তার প্রয়োজন অনেকটাই ফুরিয়ে এসেছে।

কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়টি হলো– আমাদের সাহিত্যপত্রের অভাব। শুধু অভাবই নয়– রীতিমত আকাল।

বিশ শতকে আমাদের দেশে রাজনীতি, অর্থনীতি বহুভাবে মোড় নিয়েছে এবং ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলেছে। ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে আমাদের সাহিত্যও। কিন্তু এসব যতোটা এগিয়েছে– ততোটাই পিছিয়ে গেছে আমাদের সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনা। এখন তো প্রায় শূন্যের কোঠায়। মোহম্মদী, সওগাত, সমকাল, পূবালী, কণ্ঠস্বর তো নেই-ই, এমনকি নেই উল্লেখ করার মতো তেমন একাধিক মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

আমাদের লেখক আছেন, কিন্তু নেই পর্যাপ্ত সাহিত্য পত্রিকা। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতা যে কোনোক্রমেই একটি সাহিত্য পত্রিকার অভাব পূরণ করতে পারে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে প্রকাশনা সামগ্রীর উচ্চমূল্য, বিজ্ঞাপনের সংকট, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব– এসব কিছু আমাদের লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনাকেও ব্যাহত করেছে। সুতরাং ভাল লেখক বেরিয়ে আসার পথগুলো ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এসব বাধা দূর করতে না পারলে অদূর-ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

আমাদের আনন্দ-বিষাদে, শান্তিতে-সংগ্রামে, আমাদের জাতীয় মেধা এবং মননে সাহিত্যই যে অন্যতম প্রাণশক্তি– তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের সাহিত্য পেরিয়ে এসেছে একটি শতাব্দী। এই দীর্ঘ কালস্রোতে আমাদের সাহিত্য ধারণ করেছে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়, ১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয় এবং বৃটিশের দাসত্ব, সাতচল্লিশের স্বাধীনতা, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কাল-প্রবাহ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাল, মধ্যযুগ তো বটেই, নজরুলীয় যুগ এবং তার পরবর্তী ত্রিশ থেকে দুই হাজার বছর– এই দীর্ঘ সময়ের অর্জিত সাহিত্য সার্বিক বিচারে যে সফলতা অর্জন করেছে, সেটাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

ব্যর্থতাও আছে বৈকি! কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো– সামনে এগিয়ে যাওয়া। সফলতা আর ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই তো আমাদের ঐতিহ্যস্নাত সাহিত্যই রচনা করেছে কাল এবং কালান্তরের ইতিহাস!

সাহিত্যের যাত্রা তো ক্রমবহমান। উত্থান আর পতন, ভাঙ্গা আর গড়া– কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বিশ্বাস-জারিত সাহিত্যের চূড়ান্ত বিজয়কেই প্রত্যাশা করবো, প্রত্যাশা করবো– আমাদের সৃষ্টিতে, আমাদের ত্যাগে এবং আমাদের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের আলোক ধারায়।

আমাদের সাহিত্যের আন্তর্জাতিক সম্ভাবনা

আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্য আজ দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করতে সক্ষম। সক্ষম আন্তর্জাতিকতার আকাশ স্পর্শ করতে।

'আমাদের সাহিত্য' বলতে আমি এখানে সঙ্গত কারণে বিশ্বাসী তথা প্রকৃত ঐতিহ্যবাদী মুসলমানদের রচিত সাহিত্যের কথাই বলতে চাইছি।

আবার আমার এই আলোচনা থেকে তাদেরকেও পৃথক করছি, যারা কেবল মাত্র নামেই মুসলমান। অর্থাৎ, একটি মুসলমানী নাম ধারণ করেও যারা মুসলমান এবং ইসলামের বিপক্ষে লিখে থাকেন এবং যারা তাদের লেখা দিয়ে মুসলিমদেরকে ক্রমাগত আঘাত করেন, পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী কিংবা বিধর্মীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান– এই জ্ঞানপাপী লেখকদের লেখা বাদ দিয়েই, আমাদের আজকের আধুনিক সাহিত্য যে উৎকর্ষতায় দীপ্ত, তাকে সহজেই আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বে দ্বিধাহীনে উপস্থাপন করতে পারি।

এই সাহিত্যের মধ্যে যুক্ত প্রথমত আমাদের খুব শক্তিশালী এবং সম্ভাবনাময়ী একটি মাধ্যম– সেটি হলো কবিতা।

মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, শাহাদাৎ হোসেনসহ পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কোনো কোন কবি এবং আশির দশকের একগুচ্ছ কবিকে আমরা এখানে শনাক্ত করতে পারি এবং তাদের কবিতার সাথে বহির্বিশ্বের একটি যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারি।

কবিতা ছাড়াও আমাদের এখানে এখন কিছু উজ্জ্বল গদ্যও রচিত হচ্ছে। এর ভেতরে আছে প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি। তুলনায় কম কিংবা একটু ক্ষীণ মনে হলেও এই সম্পদকেও আজ আর কোনোক্রমে ছোট করে দেখার বিষয় নয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সাহিত্যকে কিভাবে পরিচিত করা যায়? সন্দেহ নেই, এর একটিই মাত্র মাধ্যম– আর তা হলো অনুবাদ।

অনুবাদের মাধ্যমে ল্যাটিন আমেরিকা, ইউরোপ, জার্মান, এমন কি আফ্রিকাসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাম্প্রতিকতম সাহিত্যের সাথেও আমরা পরিচিত হতে পারছি। সেসব দেশের দূতাবাসসহ বিভিন্ন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান সময় উপযোগী এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যকে এখন আর তুচ্ছ করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আমার তো মনে হয়, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের লেখক-কবিরা তেমন একটা পিছিয়ে নেই।

এখন প্রয়োজন কেবল– আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সাহিত্যকে তুলে ধরা। বিভিন্ন ভাষায় আমাদের সাহিত্য অনুবাদ করে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দায়িত্বের সাথে পরিবেশন করা। সেটাই বাঞ্ছনীয় উদ্যোগ।

কাজটি বেশ কঠিন এবং জটিলও বটে। তবুও আমরা এই জটিল কাজটিও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলে সম্পন্ন করতে পারি। সেটাও সম্ভব। প্রথমত দায়িত্ব নিতে পারেন আমাদের সরকার। সরকারী উদ্যোগে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা যেতে পারে। দ্বিতীয় মাধ্যমটি হলো– সচ্ছল প্রতিষ্ঠান। যাদের সামর্থ্য আছে, যে সকল প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব বহন করতে পারে– তারা যদি একটু উদার হয়, একটু সচেতন হয়, একটু ঐতিহ্যপ্রিয় এবং দেশপ্রেমিক হয়– তাহলে তারা এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

অনেকেই মনে করেন, আমরা অপরাপর দেশ থেকে সাহিত্যে অনেক পিছিয়ে আছি।

আমার তো মনে হয়, আমাদের এক ধরনের হীনমন্যতা থেকেই এ ধরনের বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে।

আমরা তো কেবল এ যাবত বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেছি এবং বিদেশী লেখকদের সম্পর্কে জেনেছি, তাদের দেশ ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়েছি। আর তাই তাদেরকে এবং তাদের সাহিত্যকে আমরা অবচেতনে গ্রহণ করে নিয়েছি। কিন্তু আমরা আজো জানি না, আমাদের সাহিত্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্থান পাবে কিনা, আমাদের লেখক-কবিরা অপারপর দেশে গৃহীত হবেন কিনা!

এই সন্দেহ আমাদের মধ্যে এ জন্যই দানা বেঁধে উঠেছে যে, আজো আমাদের সাহিত্যকে তাদের সামনে সেইভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি।

আমার বিশ্বাস, তা পারলে– অন্যান্য দেশের সাহিত্যকে আমরা যেভাবে গ্রহণ করেছি– তারাও আমাদের সাহিত্যকে গ্রহণ করবে এবং আমাদের দেশের জন্যও সেই সাহিত্য বয়ে আনতে পারে গৌরবজনক এক বিরল সম্মান।

সারা বিশ্বে এখন মুসলমানের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। প্রত্যেক মুসলমান চান তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, তার বিশ্বাস, তার স্বপ্ন এবং তার জাগতিক ও পারলৌকিক বিষয়ে আরও অধিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। তার ঐতিহ্যকে স্পর্শ করতে।

এই অভিজ্ঞতা যেমন কুরআন, হাদীস এবং ধর্মীয় গ্রন্থের মাধ্যমে তারা আহরণ করেন, তেমনি তারা চান জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আর একটি অনাস্বাদিত বিষয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে। সেটি হলো– কলুষমুক্ত সাহিত্য। যে সাহিত্য পাঠে হৃদয়, বিবেক, বুদ্ধি এবং বিবেচনার দুয়ার খুলে যায়, জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আরো সম্প্রসারিত করে, অন্তর-আত্মাকে জাগিয়ে তোলে। আমূল দোলা দিয়ে যায় যে সাহিত্য– সেই সাহিত্যের আবেদন চিরকালীন। বিশ্বাসী চিন্তা-চেতনামূলক সাহিত্যই কেবল পৌঁছুতে সক্ষম কাল থেকে কালান্তরে। শেষ পর্যন্ত সেই সাহিত্যই বিজয় ও অমরত্ব লাভ করে।

আমরা অনর্থক কেবল দ্বিধান্বিত এবং বিভ্রান্ত হচ্ছি যে, আমাদের সাহিত্যে ঐতিহ্যের স্পর্শ থাকলে, আদর্শের ছোঁয়া থাকলে সে সাহিত্য গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রশ্ন জাগে, সেই অগ্রাহ্যকারীদের সংখ্যার চেয়ে গ্রহণকারীর সংখ্যা কি নেহায়েতই কম? সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা তো মাত্র গুটিকয়েক বিচ্ছিন্ন– বিভ্রান্ত মানুষের একটি পথভ্রষ্ট ব্যক্তি বা দেশের মুখের দিকে তাকিয়ে সাহিত্য রচনা করছিনে। আমরা সাহিত্য রচনা করছি একটি বৃহৎ জাতির জন্য। সেই জাতির নাম– মানব জাতি, মূলত বিশ্বাসী জাতি। এই বিপুল সংখ্যক মুসলমানের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের সাহিত্যের পিপাসাকে মেটানোও কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহিত্য থেকে আমরা কেবল মাত্র সেইটুকু গ্রহণ করবো, যেটুকু আমাদের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু তাদেরকে জানার ব্যাপারে আমাদের কোনো সীমাবদ্ধতা থাকবে না। আবার আমাদের সাহিত্যকে যদি সেইভাবে তাদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়, তাহলে এটাও সম্ভব যে, আমাদের সাহিত্য থেকেও অনেক কিছু তারা গ্রহণ করতে

পারেন। শিখতে পারেন। সুতরাং সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বিনিময়টাও অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়।

আমাদের দেশের অনেক লেখক– কবিই আছেন, যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের লেখায় তার কোনো ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ যে বিশ্বাসকে তারা লালন করেন, সেই বিশ্বাসের প্রকাশ তাঁদের লেখায় অনুপস্থিত।

এরও একটি কারণ আছে। আর সেটিও হচ্ছে তাঁদের এক ধরনের হীনমন্যতা। তাঁরা দ্বিধামুক্ত হতে পারেন না যে, আমার বিশ্বাসের প্রতিফলন আমার লেখায় স্থান পেলে পাঠক তা গ্রহণ করবেন কি না। আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গীও কাজ করে, সেটি হলো– স্বীকৃতির মোহ।

কিন্তু আমাদের ভেবে দেখা জরুরী যে, কারা আমাদেরকে গ্রহণ করবেন? যারা গ্রহণ করবেন– তাঁরা আমাদেরই পাঠক। আমাদেরই লেখক। অর্থাৎ, তাঁরা এই সমাজেরই অধিবাসী। নোবেল পুরস্কার কিংবা ইহুদী-খ্রিস্টানদের প্রবর্তিত যে কোনো পুরস্কার ও তাদের আদর্শে লালিত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কারের অন্ধমোহে আমরা আমাদের শতকোটি মানুষের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষাকে, আমাদের আদর্শ এবং ঐতিহ্যকে কিভাবে অস্বীকার করবো? কোনো প্রকৃত মুসলিম লেখকের এ ধরনের ক্ষুদ্র মানসিকতা থাকা উচিত নয়।

কোনো মুসলমানকে একটি বিধর্মী প্রতিষ্ঠান কেন পুরস্কৃত করবে? তবে হ্যাঁ, পুরস্কৃত করবে তখনই, যখন তারা তাদের চাওয়া-পাওয়াকে সেই লেখকের মধ্য দিয়ে আদায় করে নিতে সক্ষম হবে।

একজন মুসলিম লেখক কেন ইহুদী-খ্রিস্টানদের কাছে পুরস্কারের জন্য তাঁর মাথা বিক্রি করে দেবেন? কেন এই সামান্য সম্মাননার জন্য তাঁর ইতিহাস-ঐতিহ্যকে, তাঁর মূল্যবোধকে হত্যা করবেন? কি প্রয়োজন সেই পুরস্কারের, যে পুরস্কার আমার জন্য জাগতিক অর্থ বয়ে আনলেও আমার জাতির জন্য বয়ে আনবে কলঙ্ক?

আমরা এখানেও বিবেচনা করতে পারি। নিশ্চয়ই যার যার কাজের স্বীকৃতি এবং সম্মাননা– তাঁর ন্যায্যগত প্রাপ্য বা অধিকার। এই পাওনা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করলে অন্যায় করা হবে। এক্ষেত্রে আমরা নোবেল পুরস্কার কিংবা এই জাতীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিংবা রাজনৈতিক পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে বরং আমরাও এমন একটি আন্তর্জাতিকমানের পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে পারি, যে পুরস্কার হতে পারে নোবেল পুরস্কারের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান। অনেক বেশী দামী। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্বের জাগ্রত বিশ্বাসী বিবেকগুলোর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের। আর এজন্য অবশ্যই তাঁদেরকে দায়িত্বের সাথে একত্রিত হতে হবে এবং সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অন্তত মুসলিম সাহিত্য ও লেখকদের কল্যাণের কথা ভেবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি।

মানতেই হবে– সাহিত্য বিশ্বজনীন। কিন্তু তার ভেতর যদি আমি আমার অস্তিত্বকে,

আমার বিশ্বাস-ঐতিহ্য ও শেকড়কে খুঁজে না পাই, তাহলে সেই বিশ্বজনীনতার কি মূল্য থাকতে পারে?

আমরা আমাদের বিশ্বাস এবং অস্তিত্বকে সমুন্নত রেখেই আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারি। পারি আন্তর্জাতিকতার আকাশ স্পর্শ করতে। আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব এবং অনিবার্যভাবেই সম্ভব। কেননা আমাদের সামনে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়েও একটি বিশাল বিশ্বাসের সমুদ্র, রয়েছে একটি বিশাল মানচিত্র, একটি বিশাল জাতি এবং একটি বিশাল পৃথিবী। অতএব, আমাদের সাহিত্যিক দায়িত্ব ও কর্তৃব্যের সীমাও অপরিসীম।

আমাদের সাহিত্যের ডানা উন্মুক্ত। তার শেকড় আমাদের বিশ্বাসের অনেক– অনেক গভীরে। সেই শেকড়ধারী বৃক্ষ পলকা হাওয়ায় ভেঙ্গে পড়ার মতো নয়। সুতরাং আমাদের লেখক-কবিদের হতে হবে এ ব্যাপারে সুদৃঢ় প্রত্যয়ী এবং মনন ও শ্রমের দিক দিয়ে হতে হবে অনেক বেশী তৎপর।

এই বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয়কে সামনে রেখে আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করা গেলে আমার বিশ্বাস, তাতে সফলতা এবং কল্যাণ আসবে। সে কল্যাণ হবে আমাদের জন্য তথা আমাদের জাতির জন্য অনেক মহান, অনেক মূল্যবান।

শুধু প্রয়োজন আমাদের মানসিকতাকে আরও বিস্তারিত করার। প্রয়োজন আমাদের চৈতন্য এবং বোধটাকে আরও শাণিত করার এবং প্রয়োজন– আমাদের সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেবার মতো সঠিক পদ্ধতি এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করার।

কারণ একথা ভুলে গেলে চলবে না, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম অবদানাই মুখ্য। যত দিন যাবে– ইতিহাসের পাতায় এই সত্য আরও বেশী সুদৃঢ় হবে বলে আশা রাখি।■

লেখক-পরিচিতি : মোশাররফ হোসেন খান– কবি, প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী, সম্পাদক– মাসিক নতুন কলম।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৬ই ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

মাতৃভাষার গুরুত্ব

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

■

মাতৃভাষা কাকে বলে?

'মা', 'মাতৃভূমি' ও 'মাতৃভাষা' এ তিনটি শব্দ মানুষের নিকট অতি প্রিয়। কারণ এ প্রতিটি শব্দের সাথে প্রত্যেক মানুষের আজন্ম এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। মাতৃগর্ভে মানুষের জন্ম। তাই মায়ের সাথে আমাদের অস্তিত্ব বা রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমরা মাতৃস্তন পান করে মায়ের আদর-স্নেহে লালিত-পালিত হই। মায়ের সাথে এভাবে আজন্ম এক গভীর মমতার সম্পর্কে আমরা একান্তভাবে জড়িত। মায়ের আদর-স্নেহ-যত্ন ছাড়া মানব-শিশু পৃথিবীতে নিতান্ত অসহায়। অন্য প্রাণির সন্তানেরা জন্মের পর এত অসহায় থাকে না। কিন্তু মানব-শিশুর অবস্থা এদিক দিয়ে ভিন্ন। তারা জন্মের পর নিতান্ত অসহায় অবস্থায় থাকে। মায়ের বা অন্যদের আদর-স্নেহ-যত্ন ব্যতিরেকে শিশুদের জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব। শিশুর জন্ম, তার লালন-পালন ও বড় হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

মায়ের মতোই মাতৃভূমির সাথেও আমাদের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ যে দেশে জন্ম গ্রহণ করে, সে দেশের আলো-হাওয়ায় সে বেড়ে ওঠে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সব রকম প্রয়োজনে মানুষ জন্মভূমির কাছ থেকেই জীবনধারণের সব উপকরণ সংগ্রহ করে। জন্মভূমি আমাদের জীবনের সব প্রয়োজন পূরণ করে। জীবনে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জন্মভূমি সব সময় আমাদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দেয়। আমাদের জীবিকা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, আনন্দ-ভালবাসা এবং

স্বপ্ন-সাধ পূরণে মাতৃভূমি আমাদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে থাকে। তাই মায়ের প্রতি আমাদের ঋণ যেমন অপরিশোধ্য, জন্মভূমির প্রতিও তেমনি আমাদের ঋণ কখনো শোধ হওয়ার নয়।

'মা', 'মাতৃভূমি'-এর মতোই 'মাতৃভাষা'ও আমাদের নিকট অতি প্রিয়। জন্মের পর মায়ের কোলে মানব-শিশু মায়ের মুখ-নি:সৃত প্রথম যে ভাষা শেখে, সর্বপ্রথম কচি মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি উচ্চারণ করে, সেটাই তার মাতৃভাষা। সেই ভাষাতেই শিশুকাল থেকে সে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। তাই মাতৃভাষার সাথে মানুষের মমত্ববোধ অনেকটা মায়ের মতোই অকৃত্রিম মমতায় জড়ানো।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশের বাহন। ভাষা ছাড়া কোন মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। কোন কিছু বলতে বা লিখতে পারে না। কোন কিছু শেখার জন্যও ভাষা এক অপরিহার্য মাধ্যম। পৃথিবীতে অনেক ভাষা রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে প্রত্যেক মানুষের নিকট তার মাতৃভাষাই সর্বাধিক প্রিয়। এ ভাষায় কথা বলেই সে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং অতি সহজে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। এজন্য মহানবী (সা) তাঁর নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে বলেছেন ঃ "আরবী ভাষা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। কারণ এ ভাষা কুরআনের ভাষা, এটা জান্নাতের ভাষা এবং এটা আমার মাতৃভাষা।"

আরবী ভাষা মহানবীর (সা) মাতৃভাষা। এ ভাষার প্রতি তাঁর ছিল অসীম ভালবাসা। আরবী ভাষা ব্যবহারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি নিজে যেমন আরবী ভাষা সহীহ-শুদ্ধভাবে বলতেন অন্যদেরকেও তেমনি সহীহ-শুদ্ধভাবে বলার উপদেশ দিতেন। এ থেকে মাতৃভাষার প্রতি মহানবীর (সা) অনুরাগ এবং যে কোন ভাষা সহীহ-শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার প্রতি তিনি যে গুরুত্ব দিতেন তা উপলব্ধি করা যায়। নাম-বিকৃতি, ভাষা-বিকৃতি বা উচ্চারণ বিভ্রাট, অশ্লীল ও অশালীন ভাষা ব্যবহার চরম অভব্যতা। ইসলামের দৃষ্টিতে তা যেমন খারাপ, সাধারণ ভব্যতার দৃষ্টিতেও তা নিন্দনীয়। মহানবী (সা) বিভিন্ন সময় এ ধরনের অভব্য কথা-বার্তা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন। নিচে এ সম্পর্কিত দুটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী ও তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কুফরী'। তিনি আরো বলেছেন যে, 'কোন মু'মিনকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার শামিল।" (আবু দাউদ)

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন কারো সুপারিশকারীও হবেনা সাক্ষীও হবে না।' তিনি আরো বলেন : 'মুমিন কখনো অভিশাপকারী, কটুভাষী, অশ্লীলভাষী ও অশালীনভাষী হতে পারে না।" (মুসলিম শরীফ)

আরবী ভাষা রাসূলুল্লাহর (সা) মাতৃভাষা হওয়ার কারণে সেই ভাষার প্রতি তাঁর সহজাত মমত্ববোধ থাকলেও পৃথিবীর অন্যকোন ভাষার প্রতি তিনি কখনো অশ্রদ্ধা পোষণ করেননি। বরং দীনের দাওয়াত প্রচারের জন্য তিনি সাহাবাদেরকে (রা) পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা শিখতে উৎসাহিত করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, মহানবী (সা) প্রত্যেক মানুষকে

তার নিজের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে উৎসাহিত করেছেন। এটা ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহতায়ালা স্বয়ং মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন ঃ "আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।"(সূরা ইব্রাহীম, আয়াত নং- ৪)

এ কথার অর্থ অত্যন্ত সহজ ও পরিষ্কার। আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক জনম লীর কাছেই নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের কাজ ছিল স্বজাতির কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো। স্বজাতির ভাষা না জানলে তাদের নিকট সহজ, সুন্দর ও বোধগম্যভাবে দীনের দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই তার স্ব স্ব মাতৃভাষায় আল্লাহতায়ালা ওহী ও আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। এর দ্বারা আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক জনম লীর মাতৃভাষার প্রতি সুবিচার ও সমমর্যাদা প্রদর্শন করেছেন।

ভাষার পরিচয়

ভাষা মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সব প্রাণীরই নিজ নিজ ভাষা বা ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম বা অবলম্বন রয়েছে। এটা প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি সকল প্রাণিই তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য এক ধরনের ধ্বনি বা আওয়াজ উচ্চারণ করে থাকে। অন্য সব প্রাণীর ধ্বনি বা তাদের মুখ-নিঃসৃত শব্দ আমরা বুঝতে পারি না বা তার অর্থ আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। কিন্তু তারা নিজেরা হয়ত তাদের পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে এবং তার জবাব দেয়, প্রয়োজনে সে অনুযায়ী সাড়া দিয়ে থাকে। আমাদের মুখ-নিঃসৃত ধ্বনি-তরঙ্গ বা প্রতিটি আওয়াজেরই একটি প্রবহমানতা ও বৈচিত্র্য রয়েছে। ধ্বনির প্রবহমানতার ফলে এক একটি শব্দের সৃষ্টি হয়। অন্য সব প্রাণীর মুখ-নিঃসৃত ধ্বনির এ প্রবহমানতা ও বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ। তাই তার দ্বারা কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হয় না। কিন্তু মানুষের মুখ-নিঃসৃত ধ্বনির প্রবহমানতা অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় ও সীমাহীন। তাই ধ্বনির তরঙ্গমালা দিয়ে নানা অর্থবোধক শব্দ বা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হয়। ফলে অযুত শব্দের ফুলঝুড়ি দিয়ে ভাষার মালাগাঁথা সম্ভব হয়।

ভাষার ক্ষুদ্রতম ইউনিট বা উপাদান হলো ধ্বনি। ধ্বনির তরঙ্গমালা দিয়ে সৃষ্টি হয় শব্দ। তাই শব্দ সৃষ্টিতে ধ্বনি বা ধ্বনি-প্রবাহ এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কিন্তু কোন ধ্বনি বা ধ্বনি-প্রবাহকে কখনো ভাষা বলে গণ্য করা হয় না। ধ্বনি-প্রবাহের দ্বারা কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হলে, সেটাকেও ভাষা বলা যায় না। ধ্বনি-প্রবাহ যখন কোন একটি অর্থবহ শব্দ সৃষ্টি করে, তখন সেইভাবে সৃজিত শব্দসমষ্টির দ্বারা ভাষার সৃষ্টি হয়। শব্দের অর্থও কখনো আপনা থেকে সৃষ্টি হয় না। কোন বিশেষ জনমণ্ডলী যখন কোন বিশেষ শব্দ বা শব্দরাজির একটি বিশেষ অর্থ আরোপ করে বা সেভাবে তার প্রচলন ঘটায় তখনই সেসব শব্দ বা শব্দরাজি একটি বিশেষ ভাষা পরিগঠনে সহায়ক হয়। এটা গড়ে উঠতে সময় লাগে এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে তাতে বৈচিত্র্যও ঘটে থাকে। মানব-শিশু জন্মের

পর মাতৃক্রোড়ে ক্রমান্বয়ে একটি একটি করে শব্দ শেখে, কালক্রমে সে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা শিখতে সক্ষম হয়। এটাই তার মাতৃভাষা। এ থেকে বুঝা যায়, ভাষা কেউ আপনা আপনি শিখতে পারে না, কেউ না কেউ তাকে এটা শিক্ষা দেয়। শিশুর জন্য তার মা-ই হলো তার প্রথম ভাষা-শিক্ষাগুরু।

আদি মানব হযরত আদমের (আ) কোন পিতা-মাতা ছিল না। তিনি তাঁর স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকেই ভাষা শিখেছিলেন। একজন শিশুর মত তিনিও একটি একটি করে শব্দ শিখেছিলেন। সেসব শব্দের অর্থও তাঁকে শেখানো হয়েছিল। এভাবে শেখা অসংখ্য শব্দরাজিতে গড়ে উঠেছিল আদি মানবের প্রথম ভাষা। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে এ ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে প্রথম মানুষ মহান স্রষ্টার কাছ থেকে ভাষা শেখেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাও কোন বিশেষ জনম লী এভাবে তার পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে শিখে থাকে। হযরত আদমই (আ) যেহেতু প্রথম মানুষ, সেহেতু স্বয়ং আল্লাহই তাঁকে ভাষা শিক্ষা দেন। কিন্তু পরবর্তী মানুষদের জন্য এ কাজটি করেন তাদের পূর্ববর্তী অন্যসব মানুষ। এভাবে মানব সৃষ্টির যেমন একটি প্রবহমান ধারা আছে, ভাষার সৃষ্টি, বিকাশ ও বৈচিত্র্য সাধনেও তেমনি রয়েছে যুগ-যুগান্তের শ্রম ও বহু মানুষের চেষ্টা-সাধনা।

ভাষার কথ্য ও লেখ্যরূপ

ভাষার প্রধানত দু'টি রূপ। একটি কথ্য ও অন্যটি সাধু বা লেখ্য রূপ। শিশুরা মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শেখে সেটা অবশ্যই ভাষার চলতি বা কথ্য রূপ। পাঠ্য-পুস্তকে বা বিদ্যালয়ে এসে শিশুরা ভাষার প্রমিত বা লেখ্য রূপের (Stadard Language) সাথে পরিচিত হয়। কথ্য ভাষার স্থায়িত্ব কম, তা প্রতিনিয়ত খোলস বদলায়, নতুন নতুন শব্দ গ্রহণে, শব্দের অর্থ, শব্দের উচ্চারণ ও অভিব্যক্তি পরিবর্তন ও প্রসারণ-সংকোচন ঘটিয়ে থাকে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কথ্য ভাষার প্রভাব ও কার্যকারিতা অনেক বেশি। অন্যদিকে, ভাষার সাধু বা লেখ্য রূপের স্থায়িত্ব তুলনামুলকভাবে অধিক। লিখে রাখার কারণে সহজে তার রূপ বদলায় না। তাই বিচিত্র তার ব্যবহার, অবাধ ও তুলনাহীন তার প্রভাব। স্থান-কাল-পাত্রের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে অন্তহীন তার অভিযাত্রা। ভাষার লিখিত রূপ অনেক সময় বিশ্ব-জনমন্ডলীর সর্বত্র পৌঁছে যায়, কাল থেকে কালান্তরে তার অনায়াস অধিগমন, অতীতের সাথে বর্তমানের এবং বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের মেলবন্ধন রচনায় তার জুড়ি নেই।

ভাষার সাধু বা লেখ্য রূপ অসাধারণ প্রতিপত্তির অধিকারী। ভাষার লেখ্যরূপ মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে পারস্পরিক পরিচিতি লাভ, ভাবের আদান-প্রদান ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে যেমন সহায়ক তেমনি বিস্তীর্ণ বিশাল পৃথিবীকেও আজ আমাদের একান্ত পরিচিত আপন গন্ডীর মধ্যে নিয়ে এসেছে। ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, শিল্প-সঙ্গীত ইত্যাদি নানা বিষয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখাই আজ ভাষার লেখ্যরূপের বদৌলতে মানব-সভ্যতার এক প্রাচুর্যময় সাধারণ সম্পদে পরিণত হয়েছে। সমগ্র মানবজাতিই তা থেকে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে আমরা ভাষার বিচিত্র ব্যবহার ও কার্যকারিতা দেখে বিস্ময়বোধ করি। আমাদের আটপৌড়ে জীবনে সাধারণ ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন রুচি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ভাষা বিচিত্ররূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা আমাদেরকে কাঁদাতে পারে, হাসাতে পারে, নানা কৌতূহলে মনকে উদ্দীপ্ত-উল্লসিত করতে পারে, মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষোভের মত আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেতনাকে ব্যাপকভাবে জাগ্রত করে তুলতে পারে। ভাষা পৃথিবীর বিচিত্র বিষয় ও জ্ঞানকে ধারণ করে মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশালত্ব অর্জন করতে পারে। যে মহা জ্ঞান-সমুদ্রের সান্নিধ্যে জীবন উৎকর্ষমণ্ডিত হয়, নানাভাবে হয় সমৃদ্ধ, তার প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। তাই ভাষার মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে মাতৃভাষার উপযোগিতা সর্বাধিক। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় নিজেকে সম্যকভাবে প্রকাশ করা যায় না, নিজের মনের অনুভূতিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয় না, পৃথিবীর বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উপকারী বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য মাতৃভাষাই সর্বাধিক উপযোগী মাধ্যম। প্রয়োজনে অনুবাদ বা অন্য যে কোনভাবে বিদেশী ভাষার সাহায্য নেয়া যেতে পারে, তবে সেজন্য মাতৃভাষাকে কোনভাবেই উপেক্ষা বা বর্জন করা সমীচিন নয়।

ভাষার লেখ্য রূপের সীমাহীন সাফল্য ও কার্যকারিতা সৃষ্টিতে কাগজ ও মুদ্রণ শিল্পের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মূলত কাগজ ও মুদ্রণ শিল্পের আবিষ্কার শুধু ভাষার লেখ্যরূপকে অবারিত সম্ভাবনায় পূর্ণ করেছে বা জ্ঞানের বিকাশ ও চর্চাকে অবারিত করেছে তাই নয়, সামগ্রিকভাবে মানব-সভ্যতার অগ্রযাত্রায়ও সীমাহীন গতি সঞ্চার করেছে। বর্তমানে কম্পিউটার, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলেক্স, টেলিফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে লেখ্য ভাষার প্রভাব মানব-সভ্যতার বিকাশে অভুতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এর অসাধারণ প্রভাব সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। ভবিষ্যতে আরো কত কিছু আবিষ্কার হবে তা অনুমান করাও দু:সাধ্য। তবে তা লেখ্য ভাষার ব্যবহার, প্রভাব ও সম্ভাবনাকে যে আরো অকল্পনীয় সাফল্যে পূর্ণ করবে এবং তার কার্যকারিতাকে বহুমুখী করে তুলবে বর্তমানে কেবল এটুকুই অনুমান করা চলে।

ভাষা আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত

ভাষা আমাদের জীবনে মহান স্রষ্টার এক বিস্ময়কর অবদান। মহান স্রষ্টার অফুরন্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে এটা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে, মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশে, পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠির পারস্পরিক জানাশোনা, আদান-প্রদান ও পরিচিতির ক্ষেত্রে ভাষা এক অতিশয় কার্যকর, সহজ, স্বাভাবিক মাধ্যম। এ বিশাল পৃথিবীতে যেমন রয়েছে অসংখ্য জনগোষ্ঠি, গোত্র, বর্ণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও চিন্তা-মতাদর্শগত পার্থক্য তেমনি তার সাথে রয়েছে শত-সহস্র ভাষা ও বর্ণ লিপির বৈচিত্র্যময় অস্তিত্ব।

মানুষকে বলা হয় 'আশরাফুল মখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বের মূলে

রয়েছে জ্ঞান বা বিবেক। এ জ্ঞান ও বিবেকের চর্চার দ্বারাই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। তাই আদি মানব আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টির পর বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম তাঁকে জ্ঞান দান করেন। জ্ঞান লাভের অর্থ কোন কিছু সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। জ্ঞান লাভ, জ্ঞান বিতরণ বা জ্ঞান চর্চার অপরিহার্য মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই আদিকাল থেকে পৃথিবীতে জ্ঞানের চর্চা হয়ে আসছে। ভাষার মাধ্যমেই আদম (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

"এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে-সমুদয় ফিরিশ্‌তাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বললো, আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো আর কোন জ্ঞান নেই বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এ সকল নাম বলে দাও। যখন সে তাদেরকে এ সকল নাম বলে দিল তিনি বললেন আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশম লী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাও জানি।" (সূরা বাকারা : আয়াত-৩১-৩৩)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মহান স্রষ্টা আদি মানবকে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। যে কোন একটি নাম অবশ্যই তা একটি বা একাধিক শব্দের অনুষঙ্গ। যাবতীয় বস্তুর নাম শিখালেন এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মহান আল্লাহ আদি মানবকে অসংখ্য শব্দ শেখালেন। প্রকরান্তরে অসংখ্য শব্দের সমষ্টিতে তৈরি হয় একটি ভাষা। তার অর্থ মহান স্রষ্টা আদি মানবকে একটি পরিপূর্ণ ভাষা শিক্ষা দেন। এছাড়া, যে কোন বস্তুর নাম শিক্ষা দেয়ার অর্থ হলো সে বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। নামের দ্বারাই প্রত্যেক বস্তুর পরিচয় নিরূপিত হয়। যে কোন বস্তু সম্পর্কে বিষদ বিবরণ দেয়ার অর্থ হলো অনেকগুলো শব্দের সমন্বয়ে সে বস্তুর পরিচয় প্রদান করা। এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং স্রষ্টা আদি মানবকে প্রথমে ভাষা শিক্ষা দিলেন এরপর সেই ভাষার মাধ্যমে তাঁকে জ্ঞান দান করলেন।

শিক্ষার মাধ্যম ভাষা

যে কোন কিছু শেখার জন্য ভাষা অপরিহার্য মাধ্যম। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি বা ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমেও কোন কিছু শেখানো সম্ভব। কিন্তু তা বোবা-বধিরদের জন্য উপযোগী হলেও স্বাভাবিক মানুষের জন্য ভাষাই শিক্ষার সর্বোত্তম মাধ্যম। জ্ঞান অর্জন বা চর্চার মাধ্যমও ভাষা। আল্লাহতায়ালা হযরত আদমকে (আ) জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য যে ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন, সেটাই মানুষের প্রথম ভাষা। ভাষা ছাড়া জ্ঞান শিক্ষা দান বা অর্জন সম্ভব নয়। তাই ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন : 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন।'

ভাষার মাধ্যমে আল্লাহ হযরত আদমকে (আ) একে একে সবকিছু শিক্ষা দেন এবং এ শিক্ষার মাধ্যমেই তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় জ্ঞানের পরীক্ষায় তিনি ফেরেশতাদেরকেও হার মানাতে সক্ষম হন। এভাবে মানুষ সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বা আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত হিসাবে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়। এ মর্যাদার মূলভিত্তি হল জ্ঞান। আর এ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম যে ভাষা, তা আগেই উল্লেখ করেছি। তাই মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার মূলে জ্ঞান বা বিবেকের যেমন অবদান রয়েছে, ভাষার অবদান তার চেয়ে এতটুকু কম নয়।

বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি মহান স্রষ্টার এক সীমাহীন মহিমা ও অপরিসীম কুদরতের নিদর্শন। এ কুদরত প্রদর্শনের জন্যই তিনি আকাশমন্ডলী বা সৌরজগৎ ও বৈচিত্র্যময় রূপ-রসে ভরা সুন্দর পৃথিবী, বিভিন্ন বর্ণে-গোত্রে বিভক্ত মানুষ ও ভাষার সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা : অর্থাৎ 'এবং তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশম লী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা আর রূম : আয়াত ২২)

উপরোক্ত আয়াতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী, বিভিন্ন বর্ণ-গোত্র ও ভাষার বৈচিত্র্য–এসবই আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন। বিশ্বজগতের অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে যেমন নানা বৈচিত্র্য রয়েছে, মানবজাতির মধ্যেও তেমনি নানা বর্ণ-গোত্র ও ভাষার মাধ্যমে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব বৈচিত্র্যের মাধ্যমে মহান স্রষ্টার অসীম ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটাকে যথাযথরূপে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই স্রষ্টার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা সম্ভব। ইউরোপ-আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মানুষ যেমন আল্লাহর সৃষ্টি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরাও তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি। আরবী ভাষা যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, তেমনি ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, ফার্সি, ফরাসি, তুর্কি, চীনা ইত্যাদি পৃথিবীর অন্যান্য অসংখ্য ভাষাও তাঁরই সৃষ্টি। অতএব, কোন মানুষই যেমন উপেক্ষার নয়, কোন ভাষার প্রতিও তেমনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিৎ নয়।

আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করার সময় প্রত্যেক নবী বা রাসূলকেই তাঁর মাতৃভাষায় অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর নিজ নিজ এলাকার ভাষায় 'ওহী' (মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী রাসূলদের উপর নাযিলকৃত বাণী) প্রেরণ করেছেন। সেই অর্থে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এবং মোটামুটি সব প্রধান ভাষাতেই যে আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। এরদ্বারা সকল ভাষারই মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। ইসলাম সকল মানুষের মর্যাদাকে যেমন এক দৃষ্টিতে দেখে, মানুষের সকল ভাষার প্রতিও তেমনি সমান শ্রদ্ধাশীল।

মাতৃভাষার গুরুত্ব

প্রত্যেক নবীকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁর মাতৃভাষাতেই আল্লাহতায়ালা ওহী বা ঐশী আদেশ প্রেরণ করেছেন। এরদ্বারা প্রত্যেক মানুষের মাতৃভাষার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং মাতৃভাষার গুরুত্ব কতটা তা বুঝানো

হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের প্রতি আল্লাহ যে ওহী নাযিল করেন তা প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির জন্য উপদেশ বা জীবন চলার পথের নির্দেশাবলী। আল কুরআনের শুরুতেই আল্লাহ্ বলেছেন : "এটা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২)

উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর কিতাব বা ওহী মানবজাতির জন্য হিদায়াত বা পথ-নির্দেশ স্বরূপ। যদি সে উপদেশ বা নির্দেশাবলী যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব না হয়, তাহলে তা অনুসরণ করাও অসম্ভব। তাই মহান স্রষ্টা তাঁর নির্দেশাবলী যখন যে যুগে যে দেশে, যে নবী বা রাসূলের উপর নাযিল করেছেন, তখন সে নির্দিষ্ট জনমণ্ডলী ও নবী-রাসূলের মাতৃভাষাতেই তা নাযিল করা হয়েছে, যাতে তা সম্যক উপলব্ধি করা এবং অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়।

আল কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে, এমন কোন সম্পদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। তাদের (পূর্ববর্তী বিভিন্ন মানব-সম্প্রদায়) নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি (অর্থাৎ ছোট ছোট আসমানী কিতাব-সহীফা) ও দীপ্তিমান কিতাবসমূহ। (সূরা আল ফাতির : আয়াত-২৪-২৫)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহতা'য়ালা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত ছোট-বড় বিভিন্ন আসমানী কিতাবকে 'নূর' বা আলোকোজ্জ্বল অভ্রান্ত দিক-নির্দেশনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাদের উপর এসব কিতাব বিভিন্ন যুগে নাযিল হয়েছে, তাদের বোধগম্য ভাষায় সেটা লেখা না হলে, তা উপলব্ধি করা বা বুঝা সম্ভব হতো না। কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। এরদ্বারা মাতৃভাষার গুরুত্ব কতটা তা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

ইরশাদ হয়েছে : "তিনি বললেন হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ (যুক্তিপূর্ণ কথা) দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। আমি তার জন্য ফলকে সর্ব-বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি; সুতরাং এগুলি মযবুতভাবে ধারণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহাদের যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র সত্যবাদীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব।" (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৪৪-৪৫)

আল কুরআনের শরীফের অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ "তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন; সে তাঁর (আল্লাহ) আয়াত তাদের (মানুষ) নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১৬৪)

অতএব বিশ্ব-স্রষ্টার পবিত্র কালাম থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পৃথিবীর সব অঞ্চল, যুগ ও জনমণ্ডলীর জন্যই নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রেরিত স্থানের ভাষাই ছিল নবী-রাসূলদের ভাষা এবং সেসব ভাষায়ই বিভিন্ন যুগ, জনমণ্ডলী ও

স্থানের উপযোগী করে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীর কোন ভাষাই তুচ্ছ বা নিন্দনীয় নয়, সকল ভাষাই আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে গণ্য এবং সে হিসাবে সমান মর্যাদার অধিকারী।

পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলকে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছিলেন এক একটি নির্দিষ্ট এলাকা ও সম্প্রদায়ের জন্য। তাঁদের নিকট প্রেরিত কিতাবও ছিল একটি নির্দিষ্ট এলাকা, সম্প্রদায় ও সমকালীন যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে। তাই সে সব কিতাব স্থায়ীভাবে অক্ষত অবস্থায় ধরে রাখবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ফলে কালস্রোতে তা অবলীলাক্রমে অবলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু আখিরী নবীকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সমগ্র বিশ্ব, ভাষা-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ ও সকল যুগের জন্য। তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল কুরআনও পৃথিবীর সর্বকালীন সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ। এ মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের দায়িত্বও স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অনন্য ব্যতিক্রম।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যে মহামানবের মাধ্যমে প্রেরিত হয়, সে মহামানবের মাতৃভাষা আরবীতেই তা রচিত। এটা যদি মহানবীর মাতৃভাষা, তৎকালীন আরববাসীর বোধগম্য ভাষায় রচিত না হতো তাহলে এটা প্রেরণের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতো। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন ঃ "এটা (কুরআন) আমি অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা ইউসূফ : আয়াত-২)

আল্লাহ্ কুরআনে অন্যত্র বলেন : "আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।" (সূরা যুমার : আয়াত-২৮)

মানুষ জেনে-শুনে-বুঝে যাতে যথার্থ হিদায়াত লাভ করতে পারে, অন্যায়-অসত্য পথ থেকে বিরত হয়, ন্যায় ও কল্যাণের পথে চলতে সমর্থ হয়, সে উদ্দেশ্যেই আল কুরআন মহানবী (সা) ও তাঁর স্বদেশবাসীর মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যথার্থরূপে কুরআনের বাণী বুঝে মহানবী (সা) প্রথমত তা নিজের জীবনে পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেন, তারপর পর্যায়ক্রমে তাঁর নিকট সাহাবাদের জীবনে, নিজ জন্মভূমির অধিবাসীদের জীবনে এবং সর্বশেষে আরব-ভূখ র বাইরে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের মানুষ তথা বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে দেন। যদি আল-কুরআন মহানবীর (সা) মাতৃভাষায় নাযিল না হতো তাহলে তার পক্ষে এটা অনুধাবন করা কষ্টকর হতো এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলা এবং অন্যদিকে তার ভিত্তিতে শিক্ষাদান করাও কঠিন হতো। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ "এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা ও তার চারপাশের জনগণকে।" (সূরা শূরা : আয়াত-৭)

এরপর আল্লাহ্ বলেন : "আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য।" (সূরা কামার : আয়াত-১৭)

পৃথিবীতে যে কোন একটি ভাষাতেই যে কোন একটি গ্রন্থ রচিত হয়। পরবর্তীতে অন্য যে কোন ভাষায় তা অনূদিত হতে পারে। আল-কুরআন বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সবগুলো

প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাছাড়া, সহজ ভঙ্গীতে আল কুরআন রচিত হওয়ার কারণে আরবীভাষী তো বটেই অন্য ভাষার লোকেরাও তা সহজে পাঠ করতে পারে ও মুখস্থ করতে পারে। আল কুরআনের ছন্দময়, অলংকারবহুল ও অসাধারণ শ্রবণ-সুখকর ভাষা-মাধুর্যের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। ফলে পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য লোক কুরআন মুখস্থ করেছে, যা অন্য কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না।

আরবী ভাষার বিশ্বজনীনতা

সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং সর্বকালীন সকল মানুষের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কারণে বিশ্ব-মুসলিম তথা মানবজাতির নিকট আরবী ভাষা একটি স্থায়ী বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্ব-মানুষের নিকট বিশ্ব-স্রষ্টার বিধান মূল আরবীতে লিপিবদ্ধ। মহানবীর (সা) সুন্নাহ তথা অসংখ্য হাদীস বা উপদেশাবলীও মূল আরবীতে সংরক্ষিত। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আরবী ভাষাও ক্রমান্বয়ে বিশ্বজনীন একটি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। ইসলামের অসংখ্য ধর্মীয় পরিভাষা পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মুসলমানদের নিকট মূল আরবী ভাষাতেই প্রচারিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ধরনের প্রায় কয়েক হাজার আরবী শব্দ পৃথিবীর সকল ভাষাভাষী মুসলমানের নিজস্ব ভাষা-সম্পদে পরিণত হয়েছে। এছাড়া, নামাযে সূরা তিলাওয়াত করা ছাড়াও বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের মুসলমানগণ প্রায় প্রতিদিনই কুরআনের কিছু কিছু অংশ পাঠ করেন, অনেকে তা মুখস্থ করেন এবং অনেক সময় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তা চর্চাও করে থাকেন। তাই দেখা যায়, শুধুমাত্র কুরআনের কারণে দেশ-কাল নির্বিশেষে বিশ্ব-মানুষ বিশেষত মুসলমানদের নিকট আরবি ভাষার এক অনন্য মর্যাদা রয়েছে।

উপরে উদ্ধৃত আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, মাতৃভাষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তা সে যে কোন ভাষাই হোক না কেন। ইসলাম কোন বিশেষ স্থান, কাল ও সম্প্রদায়ের জন্য নয়। সকল সৃষ্টিই আল্লাহর, সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা, সকল জনগোষ্ঠীর ভাষাই আল্লাহর দান। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই ইতর বিশেষ নয়। সকল মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদাই সমান। তবে পৃথিবীতে সকল মানুষ যেমন সমান নয়, সকল ভাষাও তেমনি সমান উন্নত নয়। মানুষ নেক আমলের দ্বারা যেমন মহৎ ও মর্যাদাবান হতে পারে, ভাষাও তেমনি চর্চা ও অনুশীলনের দ্বারা উৎকর্ষমণ্ডিত হতে পারে এবং পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার স্থান লাভ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে উন্নততর ভাষার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। আবার মাতৃভাষার প্রতি অন্ধভক্তি দেখাতে গিয়ে অন্য ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনও অযৌক্তিক। যে ভাষা আমার মাতৃভাষা নয়, সেটা অবশ্যই অন্য কারো মাতৃভাষা। মাতৃভাষার প্রতি আমার অনুরাগ যেমন সহজাত-অন্যের ক্ষেত্রেও সে অধিকার স্বীকার করে নেয়াই সঙ্গত।

মাতৃভাষা স্বকীয় প্রতিভা বিকাশে সহায়ক

মানুষের মানবিক মর্যাদা এবং অধিকারসমূহের মধ্যে মাতৃভাষা অন্যতম। মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার এবং সে অধিকার সংরক্ষণ মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মাতৃভাষা ব্যতীত মনের ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করা দুরূহ। পৃথিবীতে কোন বড় কবি বা সাহিত্যিকই তাঁর মাতৃভাষা ছাড়া অন্যকোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে অমরত্ব লাভে সক্ষম হন নি। কোন কিছু বুঝার জন্য মাতৃভাষার অনুষঙ্গ একান্ত আবশ্যক। মাতৃভাষার সাথে মানুষের একটা সহজাত প্রবণতা অবিচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান। এ সহজাত প্রবণতাকে অস্বীকার করা কেবল অবান্তরই নয়, আত্মঘাতীর সমতুল্য। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। পরে তাঁর শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শে তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা করে অমরত্ব লাভ করেন। মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা না করলে তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটতো না এবং তিনি কখনো এভাবে খ্যাতি লাভেও সক্ষম হতেন না।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়া হয়। অথচ তখন পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন লোকের ভাষা ছিল বাংলা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ভাষা হিসেবে গণ্য। তা সত্ত্বেও বাংলার দবিকে উপেক্ষা করা হয়। ফলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। সে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বহু ভাষাবিদ পন্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্টভাষা না করা হলে, ইংরেজ আমলে বাঙালি মুসলমানগণ শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যেমন দু'শো বছর পিছিয়ে গিয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীরাও তেমনি শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে আরো দু'শো বছর পিছিয়ে যাবে।" তাঁর এ অকাট্য যুক্তি ভাষা আন্দোলনে এক গভীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে এবং আপামর জনসাধারণ সে আন্দোলনে আন্তরিকভাবে সাড়া দেয়।

মূলত মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে না। নিজের মনের ভাবকেও যথাযথভাবে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। শিশুরা মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শেখে, সে ভাষাতেই তাদের শিক্ষা দান করলে তারা সেটা সহজে আয়ত্ত করতে পারে, তাদের নানামুখী সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সহজেই সম্ভব হয়। অন্য ভাষায় কিছু লিখতে বা বলতে গেলেও প্রথমে মনে মনে তা নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে নিতে হয়। মাতৃভাষা মানুষের জীবনে এমনই এক সহজাত প্রবণতা। অতএব মাতৃভাষার গুরুত্ব যে কতখানি তা এ থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

অন্য ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীতে সব দেশেই মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সরকারী কাজকর্ম, আইন-আদালত তথা পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বত্র মাতৃভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে যে দেশে একাধিক

ভাষা প্রচলিত রয়েছে, সেখানে আন্তঃআঞ্চলিক (Lingua Franca) ভাষা হিসেবে কোন একটি বিশেষ ভাষা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য যে কোন এক বা একাধিক ভাষা শেখা যায়। নিজের মাতৃভাষায় অন্য ভাষার সাহিত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ও অনুবাদ করে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য, বিশ্ব-সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল দিগন্তে সমুপস্থিত করার জন্য মাতৃভাষা ছাড়া অন্য যে কোন এক বা একাধিক ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু সে জন্য গোটা দেশ ও জাতির জনগণকে অন্য ভাষা শেখার প্রয়োজন পড়ে না। কিছু সংখ্যক লোক তা শিখলেই যথেষ্ট।

ভাষার ব্যবহার সর্বব্যাপক। ভাষার দ্বারা আমরা কেবল দৈনন্দিন জীবনে পরিবার ও সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করি তাই নয়; ভাষা আমাদের সাহিত্য নির্মাণে, রাজনৈতিক-সামাজিক ধারণা পরিপোষণ ও প্রকাশে, জনমত সৃষ্টিতে, অর্থনৈতিক-কারিগরী অভিজ্ঞান অর্জনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবিধ প্রয়োগ ও আবিষ্কারে, ধর্মীয় বা অন্যান্য সব ধরনের মতবাদ ও আদর্শ প্রচারে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম। আমাদের জীবনের সকল স্তরে, সমাজ ও জগতের সকল ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার ও উপযোগিতা এক রকম অবশ্যম্ভাবী। বলতে গেলে, মানব-সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে ভাষার এক অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফলে যে দেশ বা জাতি তার ভাষার চর্চায় পশ্চাৎপদ, সে দেশ বা জাতি উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম। তাই ভাষার যথাযথ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ চর্চা ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই কোন দেশ বা জাতির উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। আর এ কাজটি যার যার মাতৃভাষায় সম্পন্ন করাই সহজতর ও সঙ্গত।

ভাষার শাখা-প্রশাখা

আদি মানব-মানবীর ভাষা ছিল একটাই। একাধিক ভাষার তখন কোন প্রয়োজনও ছিল না। আদম-সন্তানের বংশ-বিস্তারের ফলে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষ ক্রমশ বসতি গড়ে তোলে। বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে মানুষের এক অকৃত্রিম আদি ভাষাও নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এভাবে স্থানভেদে অনেক ভাষার যেমন সৃষ্টি হয়েছে, কালভেদে আবার তেমনি অনেক প্রাচীন ভাষা লুপ্ত বা মৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এককালের অনেক সমৃদ্ধ এবং বহুল প্রচলিত অনেক ভাষাও বর্তমানে মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। হিব্রু, ল্যাটিন, করনিশ, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক সময় এসব ভাষা পৃথিবীর বিভিন্ন জনমণ্ডলীর মধ্যে যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি এসব ভাষায় অনেক গ্রন্থাদি, এমনকি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও বিশ্ব-বিখ্যাত মহাকাব্যও রচিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এসব ভাষায় পৃথিবীর কোন অঞ্চলের মানুষই কথা বলে না, তাই গ্রন্থাদি রচনার ক্ষেত্রেও এসব ভাষার ব্যবহার অবান্তর হয়ে পড়েছে। কেবল পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় হিসাবেই কোথাও কোথাও তার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

আদি মানব হযরত আদমের (আ) ভাষা কালক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ও জনমণ্ডলীর মধ্যে বিবর্তিত, পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে অসংখ্য ভাষার জন্ম দিয়েছে। তবে সে সব ভাষা আদিতে যেরূপে ছিল, চিরকাল সেই একই রূপে অপরিবর্তিত থাকেনি। নানাভাবে তা বিবর্তিত-পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটা হলো ভাষার এক চিরন্তন মৌল স্বভাব বা প্রকৃতি। ভাষা নদীর মতো আজন্ম প্রবহমান, গতিশীল। নদী যেমন বাঁকে-বাঁকে রূপ বদলায় ভাষাও তেমনি প্রতিদিন বিচিত্র-বাহারী শব্দের অলংকারে শোভিত হয়ে উচ্চারণ, গঠন-প্রণালী ও ব্যবহার-বিধির বিচিত্র রূপ ও ভঙ্গীতে সুষমামণ্ডিত হয়ে আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নতুন নতুন রূপে ও সাজে সজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে তার নাম ও পরিচয়ও বদলায়। এভাবে ভাষার মধ্যে নানা বিবর্তন-পরিবর্তন সাধিত হয়, অনেক সময় নতুনরূপে, ভিন্ন নামে তা পরিচিত হয়। এ পরিবর্তন-বিবর্তন ও রূপ-ভিন্নতা ঘটে সকলের অগোচরে যুগের পর যুগ ধরে।

ভাষার প্রধান উপাদান

ভাষার ক্ষুদ্রতম ইউনিট ধ্বনি, তা আগে উল্লেখ করেছি। অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টিতে সৃষ্টি হয় শব্দ। ভাষার প্রধান উপাদান বা আসল সম্পদ হলো শব্দ। যে ভাষা যত অধিক শব্দ-সম্পদে বিভূষিত, যে ভাষা উচ্চারণে ও শ্রবণে যত অধিক ললিত-মধুর, যে ভাষা যত অধিক বিচিত্র ভাব প্রকাশে এবং যত বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে তা প্রকাশে সক্ষম, সে ভাষা তত বেশী সমৃদ্ধ ও উন্নত। আর এতেই ভাষার প্রাণশক্তি ও সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে থাকে। ভাষার আহরণ বা আত্মীকরণশক্তিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই নতুন শব্দ-সম্পদ সৃষ্টি ও অন্য ভাষা থেকে আহরিত শব্দরাজিকে নিজস্ব শব্দভাণ্ডারে আত্মীকৃত (Assimilate) করে নেয়ার মধ্যে ভাষার এ প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় চার হাজার ভাষা প্রচলিত রয়েছে। তবে প্রচলিত শত-সহস্র ভাষার মধ্যে এমন বহু ভাষা রয়েছে যার লেখ্য রূপ বা বর্ণমালা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের যুগেও অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। উদাহরণস্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচলিত ভাষার কথা উল্লেখ করা যায়। এসব ভাষার কোন নির্দিষ্ট বর্ণমালা নেই, ফলে সেসব ভাষায় কোন গ্রন্থাদিও রচিত হয় নি। কেবল মুখে মুখেই সে সব ভাষা প্রচলিত, নির্দিষ্ট জনগোষ্টির ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণের সীমিত পরিসরেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। অন্যদিকে, এমন অনেক ভাষা রয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের অসংখ্য মানুষ যা কথ্য ও লেখ্য উভয় রূপেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে আসছে। তবে সব ভাষা সমানভাবে সমৃদ্ধ বা উন্নত নয়। উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষাগুলোর মধ্যেও আবার গুণগত ও মানগত পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে ইংরেজি, আরবি, চীনা, ফরাসি, উর্দু, হিন্দি, বাংলা, ফারসি, তুর্কি প্রভৃতি ভাষার নাম উল্লেখ করা যায়।

ভাষার বৈচিত্র্য অনেকটা আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মতই সীমাহীন। তবে বিশাল মানব জাতি যেমন কয়েকটি বিশেষ মৌলিক উপাদানের ক্ষেত্রে একটি ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ,

ভাষার ক্ষেত্রেও সে ধরনের কিছু উপাদান বিদ্যমান। অনুবাদ, ভাষান্তর বা ভাবান্তরের মাধ্যমে পৃথিবীর ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সমন্বয়, সমঝোতা ও বোধগম্যতার সুরম্য সেতু-বন্ধন নির্মিত হয়। তাই আফ্রিকার কোন লেখক, আমেরিকার কোন ঔপন্যাসিক, ইউরোপের কোন নাট্যকার বা আরবের কোন কবির লেখাও আজ ভাষান্তরিত হয়ে আমাদের অধিগম্য হয়ে উঠেছে। এভাবে ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান ও মত-বিনিময়ের ফলে বিশ্ব মানবজাতি আজ পরস্পর পরস্পরের অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মেল-বন্ধন রচিত হয়েছে, মানুষে মানুষে, দেশে দেশে ও বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে।

পৃথিবী যত বড় হচ্ছে, সভ্যতার যত বিস্তার ঘটছে, ভাষার বিকাশ ও বৈচিত্র্য যত বাড়ছে, মানুষের মনের আদান-প্রদান ও পারস্পারিক সমঝোতার ক্ষেত্রও ততই সমপ্রসারিত হচ্ছে। এটাও মহান স্রষ্টার এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় কুদরত বই আর কিছুই নয়। আগামীতে পৃথিবীর এ অসংখ্য, বৈচিত্র্যময় ভাষার মধ্যে একটি সাধারণ ঐক্যসূত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না এবং তার মাধ্যমে বিশ্ব মানব-সমাজ অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহের অবকাশও নেই।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসংখ্য পরিভাষা আজ বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে। কোন নির্দিষ্ট ভাষা না শিখেও সেসব পরিভাষা আয়ত্ত করে অনেকটা কাজ চালিয়ে নেয়া সম্ভব। যেমন– রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিকম, টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্ট, মোবাইল, কম্পিউটার, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ওয়ারলেস, ওয়াকিটকি, ফ্যাক্স, টেলেক্স, ফটোকপি, প্রিন্টার, মেসেজ, কুরিয়ার ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সব মানুষই ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত আরো অনেক শব্দ বা পরিভাষা আছে যা সকলেই ব্যবহার করে থাকে। এভাবে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়েও বেশ কিছু শব্দ বিশ্বব্যাপী সর্বত্র সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর দ্বারা সকলের অজান্তে এক সাধারণ আন্তর্জাতিক ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ আন্তর্জাতিক ভাষার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অব্যাহত বা আরো দ্রুততর হবে বলে ধারণা করা চলে। এর দ্বারা ভবিষ্যতে একটি সর্বজনবোধ্য আন্তর্জাতিক ভাষা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে তা হবে একটি নতুন সংযোজন। অন্য ভাষা বা বিদ্যমান কোন ভাষা এর ফলে বিলুপ্ত হবে না, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। প্রত্যেকের মাতৃভাষা চিরকাল যে তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তার কারণ এই যে, উপরে নির্মীয়মান যে আন্তর্জাতিক ভাষার উল্লেখ করা হলো বহুলাংশে তা কৃত্রিম, প্রয়োজন ও ব্যবহারের উপর তা শেখা নির্ভর করে। প্রয়োজন ও বিশেষভাবে ব্যবহার করা ব্যতীত উক্ত ভাষার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কিন্তু মাতৃভাষা মানুষের স্বভাবজাত, জন্মের পর মাতৃক্রোড়ে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে তার চর্চা ও বিকাশ। তাই মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ সকল মানুষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী।

উপসংহার

মাতৃভাষার গুরুত্ব কখনো হ্রাস পাবে না। মাতৃভাষার চর্চা, প্রচার ও প্রসারের দ্বারা তাকে সমৃদ্ধতর করে ভাবের প্রকাশ ও জীবনের বিকাশকে অবারিত করে তোলার মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নির্ভরশীল। এরদ্বারা মাতৃভাষার গুরুত্ব, পরিধি ও বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বর্তমানে পৃথিবীতে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। সেই হিসাবে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা হচ্ছে 'বাংলা'। বাংলাই বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। বাংলাদেশ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, সিয়েরা লিওনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রচলন রয়েছে। এছাড়া, শুধু বাংলাদেশেরই প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছে। এরদ্বারা বাংলা ভাষা এক আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং একে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আমরা দীর্ঘ দিন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি, বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে পৃথিবীতে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছি। এ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। ফলে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদাও বিশ্বব্যাপী আজ স্বীকৃত। তাই বাংলা ভাষার যথাযথ চর্চার দ্বারা আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদাকে আরো সমুন্নত করে তুলতে আমাদের অধিকতর দায়িত্ব-সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে।■

লেখক-পরিচিতি : অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান- প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ এবং সভাপতি- ফররুখ একাডেমী।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

সাহিত্য সেমিনার
স্মারক-গ্রন্থ
২০০৭

সাহিত্য সেমিনার-প্রতিবেদন

মোশাররফ হোসেন খান

■

উন্নতমানের চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনার উপায়

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, বাংলাদেশের সাহিত্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী। সৃজনশীল মৌলিক কাজ করার জন্য লেখকদেরকে উপযুক্ত পরিবেশ দেয়া প্রয়োজন। তাহলে আমাদের সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। মূলত সাহিত্য হলো নদীর স্রোতের মতো বেগবাদ ও গতিশীল। সমাজও বেগবান। তাই সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সাহিত্য এগিয়ে চলে ক্রমাগত। সুতরাং আমাদের সাহিত্যকে আরও বেশী বিকশিত করার জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গত ২২শে নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সাহিত্য সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "উন্নতমানের চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনার উপায়" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক এবং শিক্ষাবিদ ড. কাজী দীন মুহম্মদ।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, কবি আশরাফ আল দীন, কবি হাসান আলীম, কবি আহমদ আখতার, কবি হারুন ইবনে শাহাদাত প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষ হিসাবে আমাদের এই উন্নত মর্যাদা দান করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের মননে, চিন্তায় বা লেখায় যেন সেই মর্যাদার ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আমরা লেখক, কবি, সাহিত্যিক– যাই হই না কেন, আমাদের উন্নতমানের আমল-আখলাকের অধিকারী হতে হবে। আল্লাহর কাছে জবাবদিহির চেতনাবোধ আমাদের মনে সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে।

মূল প্রবন্ধে ড. কাজী দীন মুহম্মদ বলেন– "সূর্য আদি কাল থেকে আছে। সমানে তাপ দিয়ে যাচ্ছে বিধান মুতাবিক। কিন্তু সারারাত সংগ্রামের পর প্রতিদিন যখন রাতের আঁধার ঠেলে ফেলে নবীন উদ্যমে উদিত হয়, তখন তার রূপ সৌন্দর্য তারুণ্য আলাদা স্বরূপে আলাদা শৌর্যে 'লয়-প্রলয়' সাথে নিয়ে, বিরাট-বিশাল অগ্নিকুণ্ডের প্রতাপ নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করে প্রলয়ঙ্করী দ্বিপ্রহরের ইঙ্গিত বহন করে। এরূপ বিশাল সম্ভাবনাময় মানুষকে আত্মবিশ্বাসের মহাবলে বলীয়ান হয়ে অভীষ্ট কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বস্তুত আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই বলেই হীনমন্যতায় ভুগি; সত্যিকার পৌরুষদীপ্ত কর্মোদ্যম প্রকাশে পশ্চাৎপদ হই।

শ্রদ্ধা দান করে বিদ্যা। বিদ্যা দান করে বিনয়। বিনয় দান করে জ্ঞান। জ্ঞান দান করে প্রজ্ঞা।"

উক্ত সেমিনারে বহু কবি, সাহিত্যিক ও লেখক উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম অবদান

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, সকল ভাষাই মহান রাব্বুল আলামীনের দান। আল্লাহর দেয়া ভাষাকে বিশ্বের প্রতি জাতি তাদের মতো করে ব্যবহার করে। আমাদের ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষাতেই আমাদের সাহিত্য রচনা এবং যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদানই মুখ্য। ইতিহাস দ্বারাই এটা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। আমাদের এই ভাষায় যত বেশী মননশীল গ্রন্থ রচিত হবে, ততোই আমাদের সাহিত্য উন্নত হবে।

গত ৬ই ডিসেম্বর, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সাহিত্য সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম অবদান" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, কবি আশরাফ আল দীন, কবি হাসান আলীম, কবি আহমদ আখতার, অধ্যাপক যুবাইর মুহম্মাদ এহসানুল হক, কবি মহিউদ্দিন আকবর, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি হারুন ইবনে শাহাদাত প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, আমাদের সাহিত্যে কলুষিত ভাষা পরিত্যাগ করে পরিশুদ্ধ এবং পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার করতে হবে। আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ভাষাকেই প্রসারিত ও বেগবান করতে হবে। আমাদের হীনমন্যতায় ভুগলে চলবে না। দাসমনোবৃত্তি ত্যাগ করে আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের পথে এগিয়ে চলতে হবে। সাহিত্যের পলিশীলিত রূপ প্রতিষ্ঠায় আমাদের সর্বদা তৎপর থাকতে হবে।

মূল প্রবন্ধে কবি মোশাররফ হোসেন খান বলেন, "আমাদের সাহিত্যের ডানা উন্মুক্ত। তার শেকড় আমাদের বিশ্বাসের অনেক– অনেক গভীরে। সেই শেকড়ধারী বৃক্ষ পলকা হাওয়ায় ভেঙ্গে পড়ার মতো নয়। সুতরাং আমাদের লেখক-কবিদের হতে হবে এ ব্যাপারে সুদৃঢ় প্রত্যয়ী এবং মনন ও শ্রমের দিক দিয়ে হতে হবে অনেক বেশী তৎপর। এই বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয়কে সামনে রেখে আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করা গেলে আমার বিশ্বাস তাতে সফলতা এবং কল্যাণ আসবে। সে কল্যাণ হবে আমাদের জন্য তথা আমাদের জাতির জন্য অনেক মহান, অনেক মূল্যবান।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

মাতৃভাষার গুরুত্ব

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম যখনই যে দেশে

প্রবেশ করেছে, সেই দেশের মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই ইসলাম সেখানে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং ভাষাকেন্দ্রিক কোনো বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা আমাদের কাম্য নয়। তবে একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহপাক, রাসূল (সা) এবং দীন সম্পর্কে আমাদের ভালোবাসার কোনো সীমা থাকা উচিৎ নয়, এছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই অবশ্যই সীমা থাকতে হবে। আমাদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সাহিত্য সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "মাতৃভাষার গুরুত্ব" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান।

পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. মাহফুজ পারভেজ, কবি আশরাফ আল দীন, কবি হাসান আলীম, অধ্যাপক যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, কবি হারুন ইবনে শাহাদাত, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি নাসির হেলাল, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, পৃথিবীতে প্রথমে একটি মাত্র ভাষাই ছিল। আল্লাহপাকই ভাষা সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনিই দেশ, কালভেদে ভাষার বিবর্তন ঘটানোর যোগ্যতা মানুষকে দান করেছেন। ভাষার মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামীন মানুষকে বস্তুজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান শিখিয়েছেন। এই পর্যন্ত অন্য সকল ভাষারই রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে কেবল আল কুরআনের ভাষা।

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান তাঁর প্রবন্ধে বলেন, " মাতৃভাষার গুরুত্ব কখনো হ্রাস পাবে না। মাতৃভাষার চর্চা, প্রচার ও প্রসারের দ্বারা তাকে সমৃদ্ধতর করে ভাবের প্রকাশ ও জীবনের বিকাশকে অবারিত করে তোলার মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নির্ভরশীল। এর দ্বারা মাতৃভাষার গুরুত্ব, পরিধি ও বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বর্তমানে পৃথিবীতে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। সেই হিসাবে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা হচ্ছে 'বাংলা'। বাংলাই বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশ ছাড়া

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, সিয়েরা লিওনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রচলন রয়েছে। এছাড়া, শুধু বাংলাদেশেরই প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছে। এর দ্বারা বাংলা ভাষা এক আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।■

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা